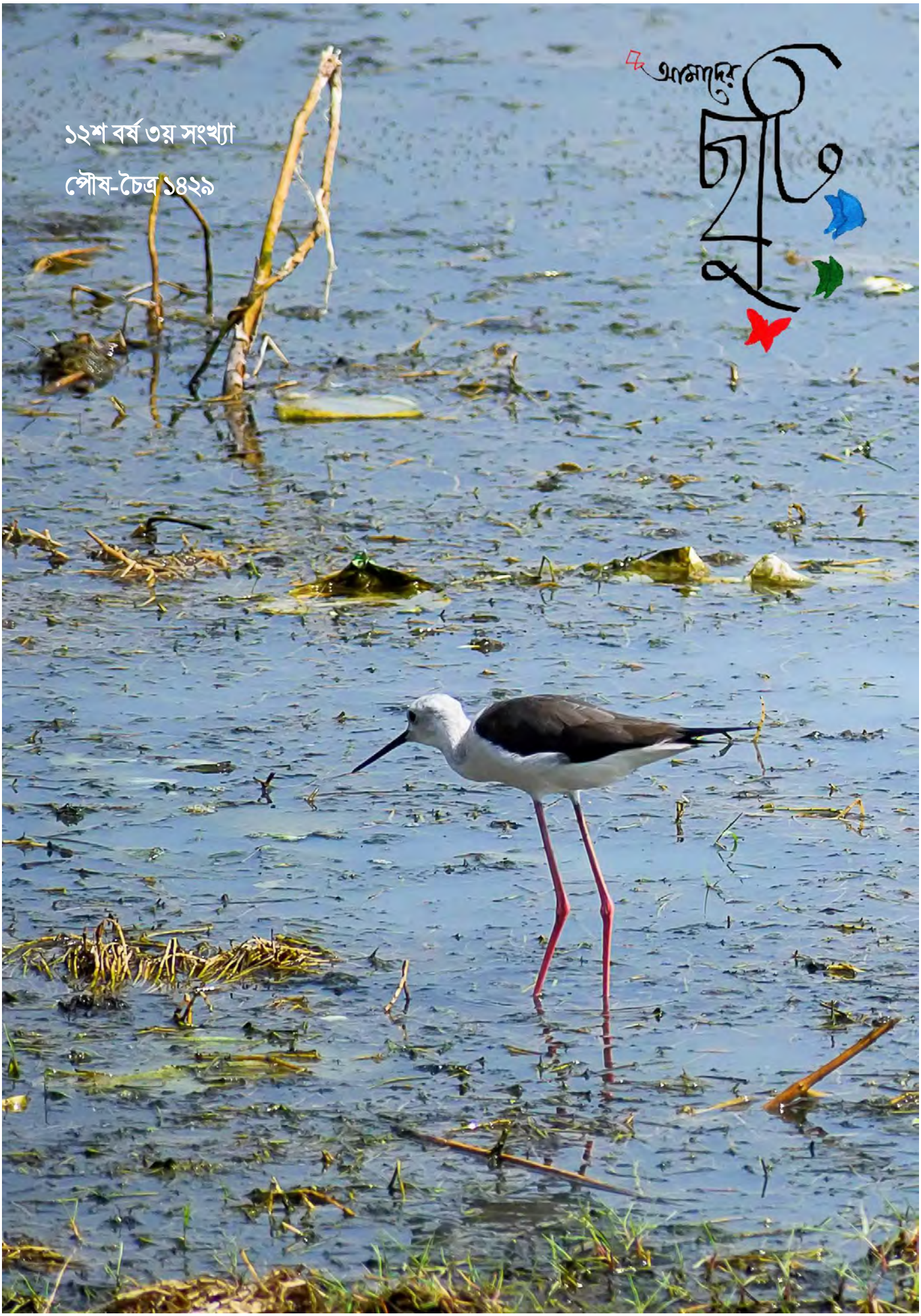

খাবারের খোঁজে লাল ঠেঙি (ব্ল্যাক উইঙ্গড স্টিল্ট) - বারকুল, ওডিষা - আলোকচিত্রী প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

১২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
পৌষ - চৈত্র ১৪২৯

মধ্যবিত্তের গতানুগতিকতায় নিজের কাজ, মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা ইত্যাদি মিটিয়ে অনেকদিন পর একটু দূরে গিয়েছিলাম - দূর মানে সিমলা-মানালি। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। ইচ্ছা ছিল হিমাচলের আরও বেশকিছুটা ঘুরে ডিসেম্বরের শেষাশেষি ফিরব। নানা কারণে হল না। যাওয়াটাই প্রায় হচ্ছিল না। শেষমুহূর্তে মনে হল এটুকুই অন্তত হোক।

সিমলায় ছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারি গেস্টহাউসে। পাহাড়ের ওপর বেশ উঁচুতে বিশাল এলাকা নিয়ে ১৮৯২-তে তৈরি হওয়া এটিই ছিল সিমলার প্রথম হোটেল। তারও আগে এখানে ছিল 'বেন্টিঙ্ক ক্যাসল' – বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের গ্রীষ্মাবাস। সামনে পুরোটাই খোলা, একের পর এক পাহাড়ের সারি – সিমলা শহরের প্যানারোমিক ভিউ। ম্যালের চত্ত্বর কয়েক পা হাঁটলেই। ম্যালে এসে ছেলেবেলার কথা খুব মনে পড়ছিল। ফাঁকা ম্যাল, সাদা চার্চ আর আপেল জ্যুস খাওয়া -সেই প্রথম। এখন দোকান আর মানুষের ভিড়ে কেমন যেন ছন্দ কেটে গেল। তবু রেলিং-এর ফাঁকে ফাঁকে বরফসাদা পাহাড়ের মাথায় মায়াবী লাল সূর্য অস্ত যেতে যেতে আমার দুঃখ খানিক মুছে নিচ্ছিল। ম্যালের একটু ওপরেই চার্চের পিছনদিকটায় জেলের কয়েদীদের পরিচালনায় একটি বুকক্যাফে হয়েছিল জানিয়েছিলেন 'আমাদের ছুটি'র লেখক কাঞ্চন সেনগুপ্ত। দেখলাম সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তবে লাদাখে গিয়ে যেমন বুঝেছিলাম উটেদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব হবে না, এবার কুফরি আর নালদেরায় বুঝলাম ঘোড়াদের সঙ্গেও তাই। তাও ঘোড়ায় চড়ে ভালোই ঘোরাঘুরি হল। দোকানপাটবিহীন সবুজ নালদেরা আর দূরে বরফ পাহাড় বড় ভালো লাগল। মনে হচ্ছিল দুটো দিন ওখানেই থেকে যাই নিরিবিলিতে।

কোভিড-এর নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে আবার বেড়াতে বেরোতে শুরু করেছি আমরা। 'আমাদের ছুটি' আপনাদের ভ্রমণকাহিনিতে সেজে উঠতে চায়। কাছে-দূরে ঘুরে এসে লেখা পাঠান আপনাদের এই ভ্রমণবন্ধুর ই-মেল-এ। ভালো থাকবেন। বাংলা নতুন বছর প্রায় এসে গেল। ভালো কাটুক দিনগুলো।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ এই সংখ্যায় ~

~ আরশিনগর ~

স্মৃতির দার্জিলিং – দময়ন্তী দাশগুপ্ত

আমাদের ছুটি – ৪২শ সংখ্যা

ইতিহাসের সন্ধানে মুর্শিদাবাদে – সৌমাভ ঘোষ

~ সব পেয়েছির দেশ ~

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক – মৃণাল মণ্ডল

অমরনাথ দর্শন – নিবেদিতা কবিরাজ

~ ভুবনডাঙা ~

টিউবিংগেন এবং বেবেনহাউসেন – কণাদ চৌধুরী

আমাদের ছুটি – ৪২শ সংখ্যা

ভিয়েতনাম- কাম্বোডিয়া – সাতান্ন বছর পরে আবার
– তপন পাল

দ্বীপের নাম সান্তোরিনি – সোমদেব পাকড়াশী

~ শেষ পাতা ~

বারকুলে একদিন – প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

টেমি চা- বাগিচায় – বাপ্পাদিত্য বর্মন

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com
© 2011 - 2023 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়

স্মৃতির দার্জিলিং

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

২০১৮ সাল। লেডি অবলা বসুকে নিয়ে গবেষণার কাজ করছি। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূত্রে তাই এবার দার্জিলিং-এ এসে উঠেছি বসুদের বাসভবন মায়াপুরী লাগোয়া বোস ইনস্টিটিউটের দার্জিলিং শাখার গেস্টহাউসে। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরেই এটা। চড়াই ভেঙে দীর্ঘ হাঁটাপথ। ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় রাস্তার ওপারে খাদের থেকে উঠে আসা ঘন লম্বা গাছের সারি। তাদের পেরিয়ে সোনারঙা কাঞ্চনজঙ্ঘায় ভোর হয়। আরও কিছুটা এগোলে ডান হাতে পড়বে লাল কুঠি – বর্তমানে দার্জিলিং হিল কাউন্সিলের প্রশাসনিক দপ্তর। আগের নাম ছিল গৌরী ভিলা। কুচবিহারের মহারাজা প্রসাদনাথ রায় তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিতে এটি তৈরি করেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে প্রথমদিকে বাড়িটি ইংরেজদের বড় বড় পার্টির জন্য ব্যবহৃত হত। পরে মহারাজা ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছেন না এই অজুহাতে ব্রিটিশরা ভিলাটি দখল করে নেয়। এই বাড়িতেই বাংলা ছায়াছবি 'লালকুঠি'-র শুটিং হয়েছিল, তারপর থেকে লোকমুখে এর নাম হয়ে যায় লালকুঠি। এর একটু পরেই জাপানী প্যাগোডা। ধৌলীর স্তূপের মতোই এটিও নির্মিত হয়েছিল জাপানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ফুজির পরিকল্পনানুযায়ী।

ব্রেকফাস্ট সেরে মায়াপুরীর ভেতরে যাই। পুরো চত্বরটা ফুলের গাছে সাজানো। নিবেদিতার মৃত্যুর পর ব্রিটিশরা রায়ভিলার দখল নিলে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর যন্ত্রপাতিগুলি এনে ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু ছোট জায়গার মধ্যে ল্যাবরেটরি গড়তে অসুবিধা হচ্ছিল। অবশেষে এখানের বাড়িগুলি কিনে নিয়ে নিজেদের পছন্দমতো বাড়ি বানানো শুরু করেন। বাড়ির ডিজাইন করে দিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথ। বাড়ির নাম 'মায়াপুরী'-ও তিনিই দিয়েছিলেন। পাশের লাগোয়া বাড়িটার নাম রেখেছিলেন 'হৈমবতী'।

'আমার জন্ম এখানেই' - কথা বলতে বলতেই বারান্দা পেরিয়ে জগদীশচন্দ্র-অবলার একতলার বসার ঘরে নিয়ে গেলেন ছেষট্টি বছরের তরতাজা দেবকুমার রায়; জীবিকার সূত্রে ছিলেন দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে, অবসরগ্রহণের পর এখন জগদীশ বোস মিউজিয়াম-এর এই বাড়ি-ঘরের আজও যিনি অতন্দ্র পাহারাদার। মায়াপুরীর সদর দরজাতে অজন্তার গুহাচৈত্যের প্রবেশদ্বারের আদলে কাঠের কারুকাজ - কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির-এর প্রবেশ তোরণও এইরকমেরই, তবে সেটি আরও অনেক বড়। বাড়ির একতলায় রান্নাঘরের লাগোয়া কাঠের সুদৃশ্য আটজনের ডাইনিং টেবল ঘিরে পাঁচটা চেয়ার আজও যেন কারও অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। রান্নাঘরের তাকে এখনও রাখা চিনামাটির বাসনপত্র, মশলাদানি। বসার ঘরের একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নিবেদিতার তৈলচিত্র চোখে পড়ে। দোতলায় বসুদম্পতির শয়নকক্ষ, ভারী পালঙ্ক, কারুকার্যমন্ডিত প্রকান্ড ড্রেসিং টেবল। হ্যাটস্ট্যান্ড, পুরনো কিছু বইপত্র, জগদীশচন্দ্রের লেখাপড়ার টেবিল পেরিয়ে আড্ডাঘর। এখন অবশ্য তা ফ্যাকাল্টি রুম। তার পাশের ঘরে সাজানো আছে বিজ্ঞানাচার্যের সৃষ্ট যন্ত্রপাতিগুলি, বিবরণীসহ। বড় বড় ফ্লেক্স-এ ছবিসহ জগদীশচন্দ্রের আশ্চর্য সব আবিষ্কারের বর্ণনা, আজকের মোবাইল ফোন, মাইক্রোওয়েভ-এরও পথিকৃৎ ছিল তাঁর গবেষণা। লম্বাটে ঘরটার একদিক কাচে ঘেরা, সেটা পেরিয়ে সামনেই খোলা চওড়া ব্যালকনি – অনেকটা ছাদের মতোই। নিচে রাস্তার ওপারে সবুজ গাছে ভরা খাদ নেমে গেছে। দিগন্তে প্রহরী কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারাবৃত শৃঙ্গেরা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখান দেবকুমারবাবু আর কাহিনির জাল বোনেন। মনে হয় সত্যি যেন এই মায়াপুরীর চাবিকাঠি রয়েছে ওঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে।

'বাবা বলতেন, তোমরা এখানে আছ, এ জায়গার ইতিহাসটা জেনে রাখো। তাঁর কাছেই শোনা সব। শুরুর থেকে বলি। আমার দাদু মানে ওঁর বাবা, দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন, তার নিচে একটা গভর্নমেন্ট হাইস্কুল আছে, সেখানের একটা

ছিল না এখানে। পেছনে অর্কিড সেন্টারটা ছিল, পাশের বাড়িটা ছিল, এই বাড়িটা ছিল, আরেকটু ওপরে কুচবিহার মহারাজার বাড়িটা ছিল, আর গুটিকয়েক বড় বাড়ি ছিল ছড়িয়েছিটিয়ে। বাদবাকি ঘন জঙ্গলই ছিল আশপাশটা। বাবা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে দাঁড়িয়ে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে আছেন, বাড়িটা দেখছেন। স্যার জে.সি.বোস আর অবলা বোস দাঁড়িয়েছিলেন এই ওপেন ব্যালকনিটাতেই। লেডি বোস ওপর থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, অ্যাই খোকা, কী দেখছ? বাবা বাংলা তেমন জানতেন না। হিন্দিতে উত্তর দিলেন, মেমসাহাব য়্যহ্ বিল্ডিং বহুৎ আচ্ছা লাগা, ইসি লিয়ে দেখ রহেঁ। অবাঙালি বুঝতে পেরে জে.সি.বোস বললেন, কেয়া করতে হো? – কুছ নাহি, সাহাব। জে.সি.বোস বললেন, ওপরে এসো। হাত নাড়িয়ে ডাকলেন। উনি উঠে এলেন উপরে। নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারপরে কাঁহা রহতে হো, কেয়া করতে হো এইসব। বাবা বললেন এখানে বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছি, বাড়িটা দেখে ভাল লাগল। সুন্দর বাড়ি। হিন্দিতেই বললেন। আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, ইধার কিঁউ আয়া? বাবা তখন বললেন, কাম ঢুঁড়নে। জে.সি.বোস বললেন, য়্যাঁহা কাম করোগে? – হাঁ, সাব, করেঙ্গে। অবলা বোস বললেন, তোমাকে কিন্তু এখানেই থাকতে হবে। থাকবে? –হাঁ, মেমসাব। হাম রহেগা। তো সেদিনই ওঁকে চাবিটাবি হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। বাবার সে কী আনন্দ, যেন কী একটা পুরস্কার সম্মান পেয়ে গেছেন। সেদিন থেকে বাবা এখানেই থাকতেন, এ বাড়ির কেয়ারটেকার। মারাও যান এখানেই। পরে অবশ্য আমরা সামনেই এখান থেকে একটু দূরে একটা বাড়ি করেছি। ওঁরা থাকতেন কলকাতায়। কোনও বছরে দুবার আবার কোনও বছর চারবার-পাঁচবার আসতেন। ঠিক ছিল না। জে.সি.বোসের ল্যাবরেটরি ছিল এখানে। উনি নানারকম গবেষণার কাজ করতেন। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ, নীলরতন সরকার, চিত্তরঞ্জন দাশ এঁরাও আসতেন। উনিশশো একান্ন সালে লেডি বোস মারা গেছেন, উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত এসেছেন এখানে।'

দেবকুমারবাবু জানালেন, অবলা বসু খুব বাগান করতে ভালোবাসতেন। একবার গাছ চুরির জন্য রীতিমতো থানা-পুলিশ পর্যন্ত করতে হয়েছিল। ঘটনাটি এইরকম – লেডি বোস একবার দুটো চারাগাছ নিয়ে এসেছিলেন ইউরোপ থেকে। দেবকুমারবাবুর বাবা তখন কেয়ারটেকার। তাঁকে দিলেন লাগাতে। সেসময় বাগানের চারধারে পাঁচিল ছিল না। যেদিন লাগিয়েছেন, তার পরেরদিন চুরি হয়ে গেল। সকালে কেয়ারটেকার দেখছেন, আরে, গাছটা তো নেই! তিনি সঙ্গে সঙ্গে লেডি বোসকে বলতে গেলেন। অবলা বোস চা খাচ্ছিলেন ডাইনিং রুমে। শুনে বললেন, চুরি হয়ে গেছে! ঠিক আছে, এটা তো থানায় রিপোর্ট করতে হবে। থানায় একটা এফ.আই.আর.লিখে দিলেন। সেটা নিয়ে কেয়ারটেকার থানায় গেলেন। এফ. আই.আর. করার পরে পুলিশ এল, কোথায় ছিল গাছটা দেখেটেখে গেল। খুঁজতে খুঁজতে তিনদিন চারদিন পরে দেখা গেল যে অন্য একটা বাড়িতে ওটা লাগানো আছে। সেখানে গিয়ে বাড়ির মালিককে পুলিশরা জিজ্ঞাসা করল, গাছটা কোথা থেকে এল? তিনি বললেন, অমুক লোক দিয়ে গেছে। সেই লোকটাকে ধরা হল এবং থানায় বন্ধ করা হল। গাছদুটোও থানায় রাখা হল। অবলা বোস কেয়ারটেকারকে বললেন, রোজ তুমি ওখানে গিয়ে গাছে জল দিয়ে এসো। তিনি দুটো গাছের জন্য দুবোতল জল ঝোলায় করে নিয়ে গিয়ে ঢেলে আসতেন। এই করে করে দশ-বারোদিন পরে গাছদুটো পুলিশ আবার এখানে ফেরত দিয়ে গেল। তারপর সে গাছকে আবার বসানো হল। তারমধ্যে একটা গাছ বাঁচেনি। অন্যটি এখনও আছে মেন গেটের পাশে। ক্যামেলিয়া। আরও নানান স্মৃতিচারণে কেটে গেল একটি বর্ণময় সকাল।

ফিরে এসে ভাগ্নে দেবেন্দ্রমোহন বসুর স্মৃতিচারণের কথা পড়ি মর্ডান রিভিউ পত্রিকায়। অবলা ও জগদীশচন্দ্রের প্রাত্যহিকী চলত একইরকম, ঘন্টাখানেক উপাসনা, প্রাতরাশের পর খানিকক্ষণ বাগানে কাটানো কিংবা আশপাশে একটু পায়চারি – জগদীশচন্দ্রকে প্রায়ই দেখা যেত টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার আর অবলা বসু হাঁটছেন। ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র ঢুকতেন তাঁর পড়ার ঘরে, সেখানে তাঁর সচিব মিস অর্নশল্ট অপেক্ষা করে থাকতেন তাঁর চিঠিপত্রের নিষ্পত্তি বা জগদীশচন্দ্র তখন যে নিবন্ধগুলি লিখছেন তা টাইপ করার জন্য। এইরকম চলত বেলা বারোটা অবধি, দুপুরের খাওয়া তারপর। লেডি বোস এইসময়টাকে ব্যবহার করতেন তাঁর দিস্তা দিস্তা চিঠিপত্র লিখতে। এত কাজের মধ্যেও তিনি বাজারে গিয়ে তাজা ফল, সবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কেনাকাটার সময় বের করে নিতেন। মায়াপুরী থেকে বাজার ছিল মোটামুটি ২ মাইল দূরে, আর প্রায় ১০০০ ফুট নিচে। সত্তর বছর বয়স অবধি লেডি বোস সাধারণত যাওয়া ও আসা দুই-ই হেঁটেই করতেন। কেবলমাত্র পরবর্তীতে, ফেরার সময় একটা রিকশা নিতেন। বাজারে খুব কম লোকই জগদীশচন্দ্রকে চিনত, দোকানদার, কুলি আর রিকশাওলারা চিনত লেডি বোসকে।

মায়াপুরী থেকে বেরিয়ে আসি। সামনের রাস্তার ওপাশে সবুজ গাছগাছালিতে ভরা খাদেই সারারাত কাটাতেন জগদীশচন্দ্র। পাইনছাওয়া পিচরাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগোনোর পরই রাস্তা আচমকাই অনেকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। চড়াই ভেঙে উঠে আসছেন হলুদ অঙ্গবস্ত্রের ওপর গাঢ় বাদামী চীর পরিহিত দুই বৌদ্ধভিক্ষু, বোধহয় সাম্প্রতিক গড়ে ওঠা জাপানি প্যাগোডার উদ্দেশে। সারাদিন ঘোরাঘুরির ক্লান্তিতে এই পথটা গাড়িতেই ফিরেছি আমরা গত দুদিনই, বেশ খাড়া এই চড়াই-ই ভাঙতেন অবলা রোজ নিচের বাজার থেকে রসদ কিনে ফেরার সময়!

পুরোনো ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছেই মসজিদের গলিতে দার্জিলিং ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির। ইতিহাস বলছে ১৮৭৯ সালে এই

সরকার থেকে নতুন জমি ও ১৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকারের উদ্যোগে ১৯২০ সালে বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণকার্য শুরু হয়। ১৯২২ সালে মন্দিরটির উদ্বোধন হয়। প্রথমদিককার ট্রাস্টিদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস (অবলা বসুর পিতা) প্রমুখ। জগদীশচন্দ্র ও অবলা প্রায়ই এখানে উপাসনা করতে যেতেন। অবলা বসু নিয়মিতই তাঁদের দার্জিলিং-এর বাড়ি থেকে হাঁটতে হাঁটতে সমাজে আসতেন।

দার্জিলিং বাজারের জিপস্ট্যান্ড থেকে একটা যাত্রীবাহী ভাড়ার গাড়িতে উঠে লেবং কার্ট রোডে রায়ভিলা-য় পৌঁছলাম। দ্বারকানাথ রায়ের বাড়িটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত পড়ে থাকার পর রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে আসায় তাদের উদ্যোগে চলছে সংরক্ষণের কাজ। দ্বারকানাথ ছিলেন সেকালের একজন নামকরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙালি অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার রায়ের ভাই। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠ কন্যা এবং সরলা রায় ও অবলা বসুর ছোট বোন শৈলবালার। দ্বারকানাথ এই বাড়িটি কেনার পর অনেকবারই খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রী অবলা বসু এসে এখানে থেকেছেন। তাঁদেরই অতিথি হিসেবে দার্জিলিং-এ বাসকালীন এই বাড়িতেই প্রয়াত হন ভগিনী নিবেদিতা। সেবারে বসুদের নিবেদিতা সহ দার্জিলিং থেকে ট্রেক করে সান্দাকফু-ফালুট যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

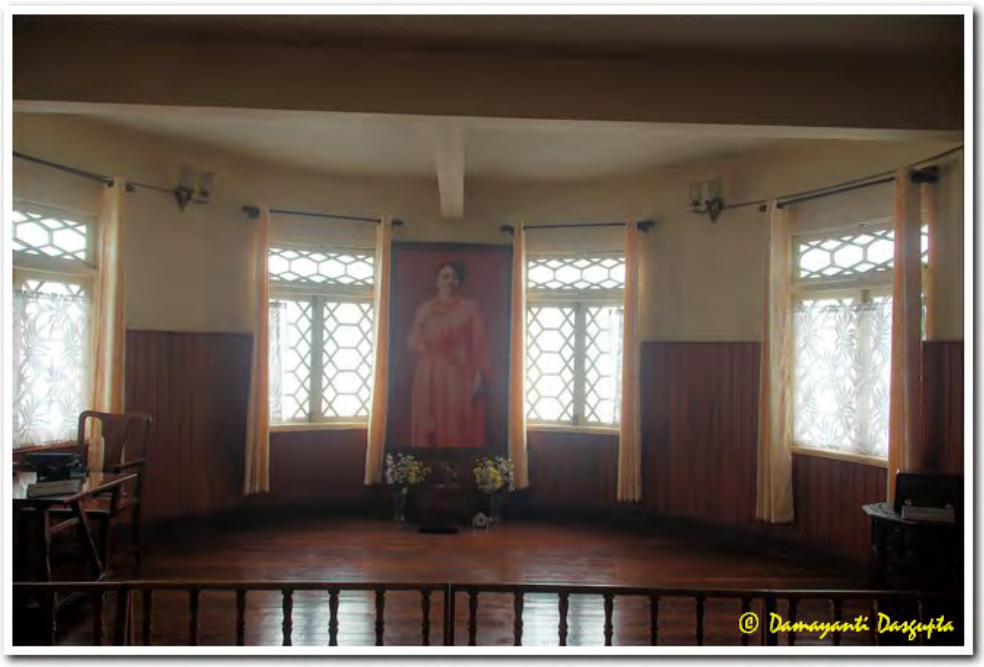

মুঠোফোনে স্বামী বিশ্বরূপানন্দ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, বোন কোথায় আছিস? বলি, যে ঘরে সব বই রয়েছে। বলেন পাশে একটা সিঁড়ি রয়েছে দেখ, ওটা দিয়ে উঠে আয় ওপরে। ওপরে উঠে নিবেদিতার ঘরের সামনে গিয়ে আবারও ফোনে কথা

রোগশয্যাপাশে অবিরত বসে থাকা অবলাকেই শেষ কথা বলে গেলেন – 'The boat was sinking, but she will see the sunrise'। শেষমুহূর্তে নিবেদিতাকে হৈমবতী উমার মতো মনে হয়েছিল অবলার। যেন পিত্রালয় থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন উমা।
দোরগোড়ায় এসে মহারাজ হাত নেড়ে ডাক দেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে রাখা চেয়ারে গিয়ে বসি। টেবিলের সামনের বেতের চেয়ারে মহারাজ, স্নেহময় চোখদুটো ঝকঝক করছে। লেখালেখি নিয়ে আলোচনা চলে। সমৃদ্ধ হই।

কাজ সেরে ঘুরে ঘুরে রায়ভিলা দেখি। মহারাজের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াই। নিরাভরণ ঘরের মেঝেতে পাতা কম্বলে বসে পড়াশুনো করছে কয়েকটি স্কুলপড়ুয়া মেয়ে, এদেরকেই পড়াচ্ছিলেন মহারাজ, আমরা আসার আগে। বাইরের বিশাল খোলা ব্যালকনি থেকে ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। বাড়ির ওপরতলায় গড়ে তোলা হচ্ছে একটি লাইব্রেরি। মহারাজের ঘরেও রয়েছে প্রচুর বই।

ম্যালে পৌঁছে গেছি। এখনও কুয়াশায় ঢাকা। ঝাড়ুদারেরা ঝাঁটা হাতে পরিষ্কার করছে। এই সকালেই পর্যটকেরা ভিড় জমিয়েছেন। ইতিউতি স্থানীয় মানুষজনও রয়েছেন। মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলার মতো ঘন কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া। ম্যালের চেয়ারগুলো সব ভর্তি। প্রভাতী ভ্রমণার্থীরা গায়ে মাথায় গরম পোশাক চাপিয়ে বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন নাহলে নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন। কেউ কেউ আবার শরীর চর্চাও করে নিচ্ছেন। ঘোড়াওলারা ইতিউতি

ম্যাল রোড দিয়ে নেমে গেলে শতাব্দী প্রাচীন দাস স্টুডিও আর তারপরে গ্লেনারি'জ। অন্যদিনের মতো সেদিকে যাব না আজ। আজকের গন্তব্য চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি। সেই বাড়িটিকেও এখন মিউজিয়াম করা হয়েছে। ম্যালের গা ঘেঁষে একটা রাস্তা নেমে গেছে – সি. আর. দাস রোড, তার ডানদিকটা খাদ। সেই পথ দিয়ে কিছুটা নামলেই বাঁহাতে দোতলা বাড়িটি পড়ে - স্টেপ এসাইড।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে অসুস্থ শরীরে দার্জিলিং যাত্রা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। সেবারে উঠেছিলেন কৌঁসুলি স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের এই বাড়ি 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ। দার্জিলিং-এ যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর মধ্যে ছিলেন গান্ধিজিও। স্বদেশের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের । এরমধ্যে একদিন তিনি জগদীশচন্দ্র-অবলার দার্জিলিং-এর বাসা মায়াপুরীতেও যান। ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই চলছিল। ১৬ জুন বিকেলে দেশবন্ধুর জীবনাবসান হয়, এই বাড়িতেই। বাইরের দরজা বন্ধ ছিল। দরজা ঠেলে চত্বরে ঢুকে দেখি বাড়ির দরজাও বন্ধ। সামনের কাঠের বেঞ্চে বসি। ভাবি এইখানে একদিন সেই মানুষগুলি বসে কথা বলেছেন, গল্প করেছেন...। আর আজ আমরা এসে বসেছি। মেঘ উঠে আসে খাদের গভীর থেকে। কুয়াশায় ক্রমশ সাদা হয়ে যায় চারদিক।

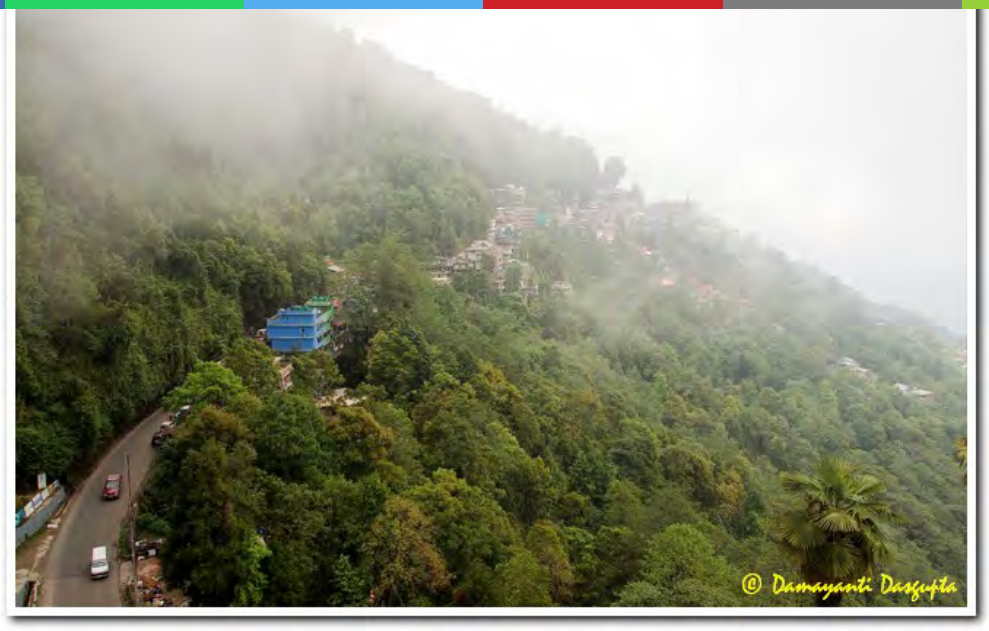

~ *মুর্শিদাবাদের আরও ছবি* ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেছেন। বর্তমানে পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি স্বাধীন গবেষণায় রত। তাঁর সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি পুরোনো ও নতুন ভ্রমণকাহিনির বই প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজ – আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা (চার খণ্ড)। ভালোবাসেন বই পড়তে, গান শুনতে, লেখালেখি করতে আর বেড়াতে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ইতিহাসের সন্ধানে মুর্শিদাবাদে

সৌমাভ ঘোষ

~ মুর্শিদাবাদের আরও ছবি ~

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

পর্ব - পাঁচ

১৪ তারিখ হোটেলে চেক-ইন পর্ব মিটিয়ে বেরোতে দেরি হয়েছিল। ১৫ তারিখ সেসবের বালাই নেই। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে চা এবং জলখাবারে ম্যাগি খেয়ে প্রস্তুত থাকলাম টোটোর জন্য। নটার মধ্যেই টোটো এসে হাজির। সেদিন গেলাম ভাগীরথীর অপর পাড়ে – খোশবাগ, ডাহাপাড়া ধাম, কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দির ও আজিমগঞ্জের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে। খোশবাগের নাম শুনে মনে ভালো খারাপ মিশিয়ে একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। কিন্তু পথে যে ঘটনা ঘটল তার জন্য একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। সেই কথাই বলব এবার।

চিরকাল গঙ্গা পেরিয়ে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অফিস সবই করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সেই পারাপারের সঙ্গে এর বিস্তর ফারাক। নৌকা চড়ে নদী পারাপার করি সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এখানে দেখলাম আমাদের টোটোটাই নৌকায় উঠে পড়ল। আমরা যারা কলকাতা বা তার আশপাশের মফঃস্বলে থাকি, তারা সাইকেল অবধি নৌকায় উঠতে দেখেছি। এখানে টোটো, বাইক তো কোন ছাড় দেখলাম ছোট ছোট গাড়ি পর্যন্ত এভাবেই যাতায়াত করে! এভাবে যাতায়াত হয় বলে নৌকায় কোনও ছইয়ের ব্যবস্থা নেই। আছে বাঁশের মাচা আর তার ওপরেই রয়েছে সওয়ারিসমেত যানবাহন । এমনকি নৌকার ঘাটগুলো পর্যন্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি। সত্যিই এক বিরল অভিজ্ঞতা! টোটোর দাদা বলল বহরমপুর আর জঙ্গিপুরে ব্রিজ আছে। একুশ শতকেও কলকাতার এত কাছের একটি জায়গার যান চলাচল দেখে অবাক হলেও পরমুহূর্তেই মনে হল ভরাবর্ষার দিনে এরকম যাত্রীবোঝাই নৌকাই তো মাঝনদীতে উলটে দিয়ে সিরাজ ও তার বন্ধুরা খুব মজা পেত। সেই নবাবি আমলের ঐতিহ্যই বোধকরি মুর্শিদাবাদ এখনও বহন করে চলেছে।

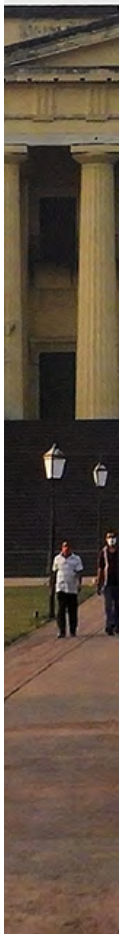

হাজির হলাম খোশবাগে। এখানেই সমাহিত বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

তবে এটিকে শুধুমাত্র সিরাজউদ্দৌলার সমাধিক্ষেত্র বলা ভুল। এটি নবাব আলিবর্দি খান প্রতিষ্ঠিত আফসারি বংশের সমাধিক্ষেত্র। সিরাজউদ্দৌলা ছাড়াও এখানে রয়েছে আলিবর্দি খান, তাঁর মা, স্ত্রী এবং সিরাজের পত্নী লুৎফন্নিসা বেগমের সমাধি। খোশবাগে আলিবর্দি খান দিল্লির জামা মসজিদের অনুকরণে একটি মসজিদ নির্মাণ করান।

বর্তমানে এসবই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে রয়েছে। আফসারি বংশের সমাধি ছাড়াও রয়েছে ফকির দানাশাহ এবং তার স্ত্রী ও পুত্রের সমাধি। সিরাজ পলাশীর যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে এই দানাশাহই তাঁকে দেখে চিনতে পারে এবং মীরজাফরের সেনাবাহিনির হাতে তুলে দেয়। তারই পুরস্কারস্বরূপ মীরনের নির্দেশে দানাশাহ-এর পুরো পরিবারকে হত্যা ও খোশবাগে সমাধিস্থ করা হয়। কথিত আছে মহম্মদি বেগ সিরাজকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার পর হাতির পিঠে করে ঘুরিয়ে ছিল। মৃতদেহ থেকে চারিদিকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ার জন্য খোশবাগের অপর পাড়ের নাম হয় লালবাগ।
খোশবাগ দেখে আমরা পৌঁছলাম প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম বা ডাহাপাড়া ধামে। প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী একজন সমাজ সংস্কারক। পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলাতে হলেও, ওঁর জন্ম হয় মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়ায়। জন্মভিটেতেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ২০০৩ সালে।

মুর্শিদাবাদের সর্বোচ্চ মন্দির এটি। বিরাট এলাকা নিয়ে নির্মিত ধামটিতে মন্দির ছাড়াও রয়েছে আশ্রমিক ও পর্যটকদের বসবাসের ব্যবস্থা। মন্দিরের সুন্দর কারুকার্য ও শান্ত পরিবেশ পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

পরবর্তী গন্তব্য মুর্শিদাবাদের প্রাচীনতম মন্দির কিরীটেশ্বরী। পুরাণমতে একান্ন সতীপীঠের একটি এই মন্দির - এখানে দেবী সতীর কিরীট অর্থাৎ মুকুট পড়েছিল। দেবীর দেহাবশেষ না পড়ায় এটিকে উপপীঠ হিসেবেও গণ্য করা হয়। তবে স্থানীয়দের মতে এখানে দেবীর কপালের তিনটি হাড় পরেছিল। যাইহোক এই মতান্তরে না গিয়ে বলা যায়, রাঢ় বাঙলার সুপ্রাচীন এই মন্দিরটির আদি নাম ছিল কিরীটকণা, যা থেকে এই গ্রামেরও নাম হয় 'কিরীটকণা'। প্রাচীন মন্দিরটি ১৪০৫ সালে বজ্রাঘাতে নষ্ট হয়ে গেলেও কারুকার্য খচিত বেদীটি বিদ্যমান। দেবীর কোনও মূর্তি এখানে পূজিত হয় না, লাল বেদীটিই এখানে দেবীরূপে সারা বছর পুজো পায়। তবে গ্রামবাসীদের মতে দেবী খুবই জাগ্রতা।

বর্তমান মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কানুনগোবংশীয় শ্রী দর্পনারায়ণ রায় নির্মাণ করান। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে কিছু শিব মন্দির। প্রতিবছর পৌষ মাসে এখানে মেলা বসে। এখন মেলা না থাকলেও একজন কাকুকে পেলাম যিনি আইসক্রিম বিক্রি করছেন। ওঃ! বলা হয়নি আজও সেই চাঁদিফাটা গরম। এই আবহাওয়ায় আইসক্রিমের গাড়ি তো মরুভূমিতে মরুদ্যান। আইসক্রিম নিয়েই টোটোতে উঠে পড়লাম। গ্রামের অপরদিকে রয়েছে রানি ভবানী নির্মিত দেবীর গুপ্ত মন্দির। সেখানে কলসীর মধ্যে লাল শালুবাঁধা অবস্থায় রয়েছে দেবীর কিরীটের কণা বা মতান্তরে দেহাবশেষ।

কিরীটেশ্বরী মন্দিরের পর আসা হল রোশনিবাগে। এখানে শায়িত রয়েছেন বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খান-এর উত্তরাধিকারী জামাতা নবাব সুজাউদ্দিন খান।

সমাধিক্ষেত্রের একপাশে রয়েছে একটি মসজিদ, অন্যপাশে একটি শিব মন্দির। শোনা গেল মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত এই মন্দিরটি নির্মাণ করান।

রোশনিবাগ দেখে এগিয়ে চললাম আজিমগঞ্জের তিন কিলোমিটার উত্তরে বরনগর গ্রামের দিকে। টোটোর দাদা বলল অনেকটা দূর। এই বরনগর গ্রামটি ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। কথায় আছে 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল'। রানি ভবানী কয়েকটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর গঙ্গাবাস এই গ্রামে। তাই এটি 'বঙ্গের বারাণসী' নামে পরিচিত। ভবানী ছিলেন অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নাটোরের জমিদার রমাকান্ত রায়ের স্ত্রী। ১৭৪৫ সালে রমাকান্ত-এর মৃত্যু হলে জমিদারির হাল ধরেন তাঁর স্ত্রী। তিনিই ইতিহাসের 'রানি ভবানী'। প্রখর বুদ্ধিমতী এই নারীর আমলে জমিদারির সীমা উত্তরবঙ্গ অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।'অর্ধবঙ্গেশ্বরী' রানি এই বরনগর গ্রামে মুখোমুখি চারটি দোচালা শিব মন্দির নির্মাণ করান আনুমানিক ১৭৫৫ সাল নাগাদ, মানে পলাশীর যুদ্ধের বছরদুই আগে। প্রতি মন্দিরে রয়েছে তিনটি করে খিলানবিশিষ্ট প্রবেশদ্বার ও তিনটি করে শিবলিঙ্গ। মন্দিরগুলো প্রাচীন বাংলার টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন বহন করছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মন্দির চারটি একত্রে 'চার বাংলা মন্দির' নামে পরিচিত। এর পেছনেই রয়েছে রানি ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী দেবীর তত্ত্বাবধানে ১৭৫৫ সালে নির্মিত ভবানীশ্বর শিব মন্দির। চূড়াটি উল্টানো পদ্মফুলের মত। কিন্তু বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় নষ্ট হতে বসেছে এই মন্দির।

এই মন্দিরগাত্রেও অসাধারণ টেরাকোটার কাজ দেখা গেল। সত্যিই বাংলার টেরাকোটা শিল্প যে তখন কোন উচ্চতায় উঠেছিল এগুলো না দেখলে বোঝা যায় না। জোড়া শিব মন্দিরও এখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে। পথে পড়ল আদ্যামার মন্দির। পুজো হচ্ছে দেখলাম।

যেতে যেতে আদ্যামার মন্দিরের ঘন্টা, কাঁসরের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল আজ থেকে দুশো আড়াইশো বছর আগে বাকি মন্দিরগুলোতেও এরকম ধুমধামের সঙ্গেই পুজো হত। আজ সব ফাঁকা। এটাই বাস্তব। একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট এখানে - একদিকে হিন্দুধর্মের স্থাপত্য আবার অন্যদিকে ইসলামিক সৌধ। এটাই তো বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য, যা আমাদের সমাজ এবং মননের মধ্যে দিয়ে ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে শত শত বছর ধরে।
আজিমগঞ্জ থেকে আবার টোটোসমেত নৌকায় উঠে এপাড়ে ফিরে এলাম। এবারের গন্তব্য তাঁতিদের ঘর। কাজ দেখলাম, দেখলাম শাড়ি বোনার ধরণ এবং যন্ত্রপাতি, শুনলাম তাদের কথা। শেষে কেনা হল শাড়ি। এবার ফেরার পালা।

হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু লম্বা হলাম। রোদ পড়ে যেতে আমরা বের হলাম হাজারদুয়ারির দিকটায়। হাজারদুয়ারির পাশে হ্যাণ্ডিক্রাফটের কিছু দোকান দেখলাম কিন্তু সেগুলো সেই সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাজারদুয়ারি বিকেলে পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই দোকানগুলো ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। এক ধরনের সাবুদানার মত মিষ্টি চেখে কিনে ফেললাম বাড়ির জন্য। আর কিনলাম দাঁতের লড়াইয়ের মত গুলাবি রেউড়ি। ফিরলাম হাজারদুয়ারির পিছন দিকের রাস্তা দিয়ে। যেখানে এক সময়ে ছিল মুর্শিদকুলি খান নির্মিত চেহেল সেতুন প্রাসাদ। এই প্রাসাদটির ভগ্নাবশেষও আজ আর নেই। পরবর্তীকালে নির্মিত বেগম মহলের কিছু অংশ এখনও দণ্ডায়মান রয়েছে।
হোটেলে ফিরে এলাম। এইবার তো আসল কথা। চিকেন তো সেদিন থাকতেই হবে ডিনারে। এরকমই সব ঠিক। হায় রে! তখন কী আর জানতাম অদৃষ্টের ইচ্ছে অন্য! আমরা তিনতলায় থাকতাম। হোটেলে ফিরে দেখি সামনের মাসির গুমটি দোকানটা বন্ধ। হয়তো মাসিরা দেরি করে দোকান খুলবে, ভেবেছিলাম একেবারে অর্ডারটা দিয়ে যাব, সেটা আর হল না। যাক পরেই আসব। বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। তিনতলায় আর কেউ নেই-ও। কিন্তু খানিকক্ষণ অন্তর গুমটির দিকে চোখ যায় আর আমরা দুজন ছোটবেলার কুমির-ডাঙ্গা খেলবার মত বলি এখনও মাসি এল না! শেষে নটা নাগাদ নিচে নামলাম, ক্ষিদের চোটে পেটে তখন একশো ছুঁচো আর তিনশো ইঁদুর ডন বৈঠক দিচ্ছে। নেমে জানলাম মাসিরা অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে গেছে সাড়গাছি। কি আর করা যাবে! অগত্যা বড়রাস্তায় এসে গরম গরম হাতে গড়া রুটি আর চিকেন খেলাম। আমাদের ইচ্ছাশক্তির জয় হল।

পর্ব - ছয়

এসে গেল তৃতীয় দিন। দূরের ঘোরা শেষ। আজ ১৬ তারিখ, দেখার মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদের প্রধান আকর্ষণ হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, এছাড়া ইমামবাড়া, মদিনা মসজিদ, ওয়াসিফ মঞ্জিল ইত্যাদি। ১৪ তারিখ ভোরের আলোয় দূর থেকে দেখেছিলাম। আজ ঢুকব ভেতরে। সকাল নটায় হাজারদুয়ারি খুলে যায়। আজ মাসির দোকান খুলেছে, চা আর ডিম টোস্ট দিয়ে পেটটা ভরিয়ে নিলাম। আজ টোটো নয়, পদযুগল সম্বল করে ঘুরতে হবে। করোনার আবহে হাজারদুয়ারির টিকিট কাটতে হচ্ছে অনলাইনে। নিজেরাও কাটা যায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের (ASI) সাইটে গিয়ে অথবা প্রধান ফটকের কাছে স্থানীয়রা থাকে, তারাও কেটে দেয়। টিকিট কেটে হাজারদুয়ারিতে প্রবেশ করার পর মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিতে হল। কী আর করা যাবে! ভেতরের ছবি তুলতে না পারলেও বাইরের ছবি তুলেছি।

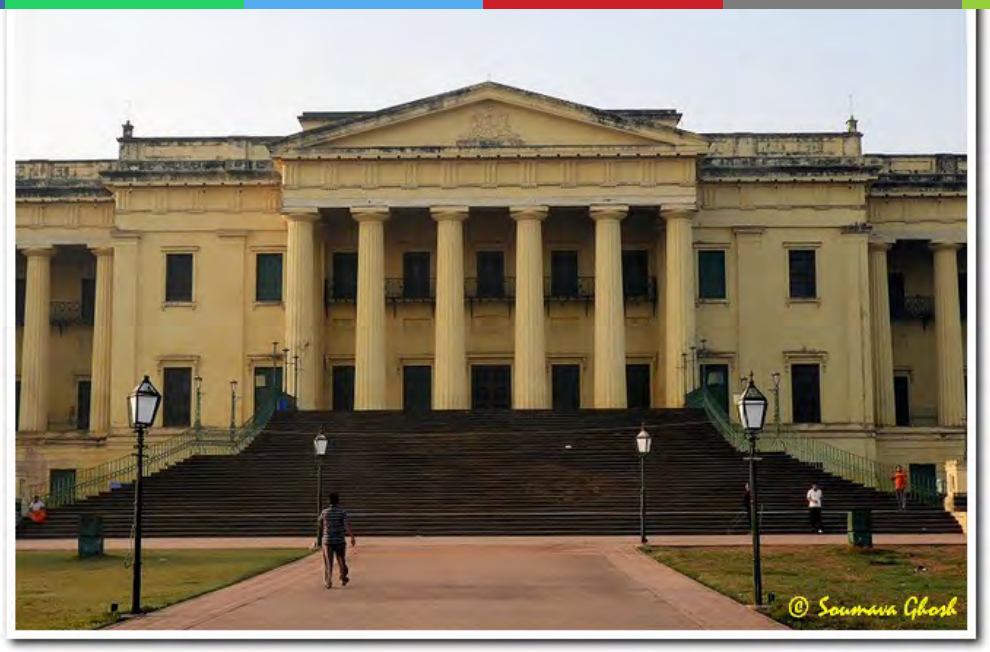

হাজারদুয়ারি প্রাসাদটি এক সময়ে নবাবদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এটি মিউজিয়াম। পূর্বতন প্রাসাদটি ভাগীরথীর গ্রাসে নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীকালে নবাব নাজিম হুমায়ুন জা এটি নির্মাণ করান। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য অজস্র অবিকল একরকম দরজা থাকলেও একটিই কেবলমাত্র আসল প্রবেশপথ। হাজার দরজার জন্যই প্রাসাদটির নাম হাজারদুয়ারি। এখানে রয়েছে নবাবদের ব্যবহৃত নানান জিনিসপত্র। প্রাসাদটিতে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনা ও নবাব বাহিনীর অবস্থানের ম্যাপ। দেখে মনে হল মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করলে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। এখন থাক সে আলোচনা। এরপর দেখলাম সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীর মদনের ব্যবহৃত কামানটি। যে কামানটি ফেটে মীর মদন গভীরভাবে আহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। এই খবর পেয়ে নবাব সিরাজ খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। ঘটনার বিবরণ দেখে এবং মীর মদনের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমাদেরও খারাপ লাগল। দেখলাম দুটি বিচিত্র আয়না, যাতে সব দেখা যায় শুধু নিজের মুখ দেখা যায় না। এছাড়া রয়েছে নবাবি আমলের বিভিন্ন তৈলচিত্র, সংরক্ষিত বিচিত্র রকমের দেশ বিদেশের পাখি, রুপো এবং হাতির দাঁতের হাওদা, বেহারাসমেত পালকি, পোর্শেলিন ও পাথরের তৈরি মূর্তি, বিষপাত্র ইত্যাদি। বিষপাত্রটি ব্যবহার হত নবাবদের খাদ্যসামগ্রী পরীক্ষার জন্য - বিষমেশানো খাবারের সংস্পর্শে এলে এর রঙ পরিবর্তন হত। প্রাসাদ থেকে বেরোনোর সময় চোখে পড়ল সিঁড়ির দুপাশে প্রস্তরনির্মিত দুই সিংহমূর্তি ও দুটি কামান, যা থেকে নবাবি আমলে তোপধ্বনি দেওয়া হত। ফেরাদুন জা-র (মনসুর আলি খান) পরবর্তী সময়ে 'নবাব নাজিম' উপাধি লোপ পাওয়ায় এই তোপধ্বনিও বন্ধ হয়ে যায়।

হাজারদুয়ারির উল্টোদিকে রয়েছে ইমামবাড়া। আগে এই স্থানে ছিল একটি কাঠের ইমামবাড়া, যেটি সিরাজ নির্মাণ করান। কিন্তু সেটি কোনও অজ্ঞাত কারণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেলে বাংলার শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জা-র আমলে বর্তমান ইমামবাড়াটি নির্মিত হয়।

তার ভেতরে কিছুটা গিয়ে চোখে পড়ল লোহার গেট, যার ভেতরে মির জাফরের বর্তমান বংশধররা থাকেন। এখানে রয়েছে একটি সুদৃশ্য ইমামবাড়া। এখানে প্রবেশ ও ফোটো তোলা দুটিই নিষিদ্ধ। একসময়ের নবাবের বংশধররা এখন লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছেন। আর একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল জাফরাগঞ্জ সমাধিক্ষেত্রের প্রধান ফটক। মির জাফরের পরিবারের সদস্যদের প্রায় এগারোশোটি সমাধি রয়েছে এখানে। শুনলাম সারা বছর বন্ধ থাকলেও মহরমের সময়ে দশ দিন খোলা হয় ইমামবাড়া। এছাড়া হাজারদুয়ারির প্রাঙ্গণে রয়েছে আর তিনটি দ্রষ্টব্য। প্রথমটি হল মদিনা মসজিদ। এই মসজিদটি নির্মাণের জন্য কারবালা থেকে মাটি আনিয়েছিলেন সিরাজ।

দ্বিতীয়টি ঘড়িঘর বা ক্লক টাওয়ার। এই গম্বুজটির মাথায় চারটি ঘড়ি বসানো ছিল রাজকর্মচারীদের সময় দেখার জন্য। কিন্তু বর্তমানে একটি অবশিষ্ট রয়েছে।

আর তিন নম্বর জিনিসটি 'বাচ্চাওয়ালী কামান'। শোনা যায় এই কামান থেকে একবারই তোপ দাগা হয়েছিল, আর তার ফলে আশপাশের দশ মাইল পর্যন্ত এলাকার গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে গেছিল।

এছাড়া হাজারদুয়ারি প্রাঙ্গণের বাইরেই ভাগীরথীর তীরে রয়েছে সিরাজ নির্মিত পীতাম্বরি মসজিদ - রাজকর্মচারীদের নমাজ পাঠের জন্য এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

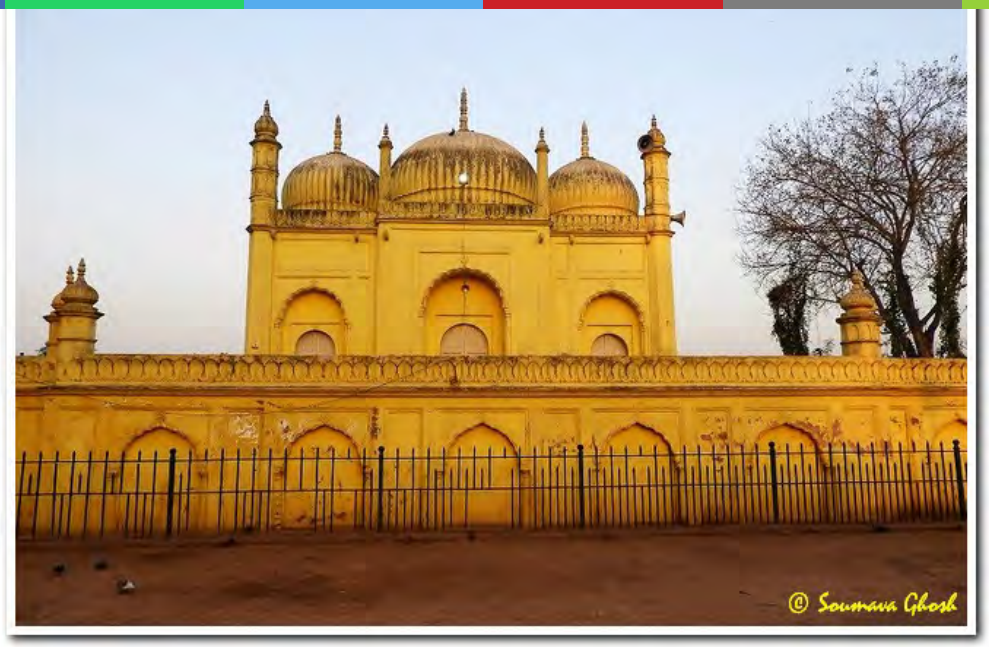

ভাগীরথীর তীর ধরে হাজারদুয়ারি প্রাসাদকে পিছনে ফেলে আর একটু এগিয়ে গেলে চোখে পড়ে নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জা নির্মিত ওয়াসিফ মঞ্জিল। বাইরে থেকেই দেখতে হল। ভেতরে পর্যটকদের ঢোকা নিষেধ।

আমাদের মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ মোটামুটি শেষ। মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু বিশ্রাম নেওয়া হল। রোদ পড়ে এলে বেরোলাম। প্রথমেই কিনে নেওয়া গেল পাতলা রসে খেলা করা ছানাবড়া ও পোস্তর মিষ্টি আত্মীয়স্বজনদের রসনাতৃপ্তির জন্য। তারপর গেলাম হাজারদুয়ারি প্রাসাদের পাশের হ্যাণ্ডিক্রাফটের দোকানে। ছোটদের জন্য নেওয়া হল টুকিটাকি জিনিস। তিন দিন ছুটি নিয়ে আসা হয়েছিল সুবে বাংলার রাজধানী দেখতে, তাও প্রায় ফুরিয়ে এল। পরদিন ফেরার পালা। অনেক কিছুই দেখা হল, জানা হল। আবার অনেক জিনিস দেখা হল না। তৃতীয় নবাব সরফরাজ খানের সমাধি পেলাম না দেখতে। দেখা গেল না মুর্শিদকুলি খানের চেহেল সেতুন প্রাসাদ। সিরাজের হীরাঝিল প্রাসাদও আজ আর নেই। যে মুর্শিদাবাদ এককালে ছিল বাংলার রাজধানী, আজ যেন তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে সেই ইতিহাসকে সংরক্ষণের অভাবের চিহ্ন। বাঙালি যে ইতিহাসবিস্মৃত জাতি সেটা মুর্শিদাবাদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।

ব্যাগপত্র গুছিয়ে হোটেলের বারান্দায় এসে বসলাম দুজনে। গল্প করতে করতেই রান্নার সুবাস এসে নাকে ঝাপটা মারছিল। আজ যে মাসির দোকান খোলা। রাত্রে রুটি আলুভাজা আর ডিমের কারি দিয়ে হালকা ডিনার সেরে নিলাম। কাল ফেরার ট্রেন ধরব।

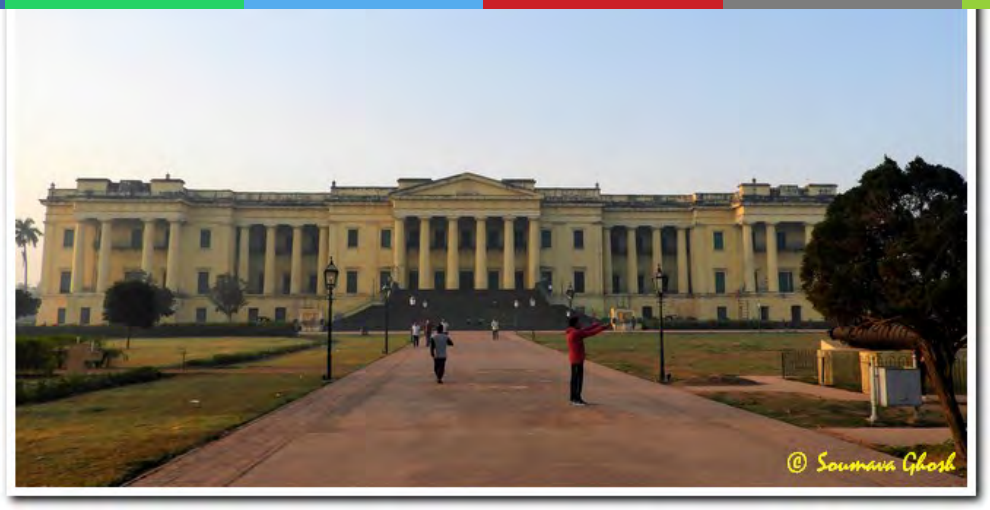

~ মুর্শিদাবাদের আরও ছবি ~

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.টেক. সৌমাভ ঘোষ বর্তমানে রেডিওফিজিক্স-এ পি.এইচ.ডি.রত। দেশবিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজের ফাঁকে অবসর কাটে বই পড়ে, ছবি এঁকে আর লেখালেখি করে। সবরকম বই পছন্দ হলেও ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও থ্রিলারের আকৃষ্ট করে খুব। এছাড়াও ভালবাসেন বেড়াতে - সমুদ্র এবং ঐতিহাসিক স্থান বেশি পছন্দের। ভ্রমণের সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকে ভোজন - "ফুড ওয়াক"।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আমাদের ছুটি
ইচ্ছে হলেই...
বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন
আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা
= 'আমাদের ছুটি' বাংলা

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক

মৃণাল মণ্ডল

~ *গঙ্গোত্রী-গোমুখ ট্রেকরুট ম্যাপ* ~ *গঙ্গোত্রী - গোমুখের আরও ছবি* ~

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

গোমুখ অভিযান :

অভিমুখে

হোটেলে ফিরলাম না। সোমাঞ্জন গেল সন্দীপদাদের ডেকে আনতে, হোটেলে। সবাই যখন ফিরল, আগের দেখে রাখা সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। তখন আটটা সাড়ে আটটা বাজে। দুটো টেবিলে ভাগাভাগি করে বসে আগে মেনু ঠিক করা হল আলোচনা করে। কারও রুটি, কারও ভাত। সঙ্গে ছোলেবাটোরা, মটরপনির আর বাটারপনির। সঙ্গে কেউ কেউ নিল টকদই। আর শেষে লস্যি। দারুণ রান্না। গোটা ট্রিপে আমাদের রসনার তৃপ্তি মেটানোর জন্য খাবারের যোগানের কথা ভাবলে ওটা ছিল পরমান্নসম।
খাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরলাম বাজারের মধ্যে। আমাদের এই আকস্মিক অভিযানের কথা শুনে সন্দীপদা না যেতে পারার আফশোসের কথা শোনাল। আর অভিজিৎদা গোঁফের নিচে হাসল।
হোটেলে ফিরে ঘরে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়লাম। জানালার বাইরে নিচে তখন খরস্রোতা গঙ্গার হুঙ্কার। আমরা চারজন (অতনু, অসীমা, রাখী আর আমি) গল্প করতে করতে ঘুমের দেশে যাত্রা করলাম।
পরেরদিন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নেওয়া হল। মোটামুটি জিনিসপত্র কমিয়ে রেখে দেওয়া হল একটা দোকানে। অসীমা রুকস্যাক কাছছাড়া করতে চাইছিল না (কেন সেটা পরে বুঝেছিলাম, সময়মতো বলব সেকথা)। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ গোমুখযাত্রার প্রস্তুতি নিলাম। হোটেলে চেক আউট করার আগে প্রাতঃরাশটা সেরে নিতে ভুললাম না। ড্রাইভারকে খাওয়ার জন্য কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া হল আর মোবাইল নম্বর নিয়ে নেওয়া হল। ঠিক হল যে গাড়িতেই রাত্রিযাপন করবে সে।
গঙ্গোত্রীর বাজার থেকে সবাই একটা করে লাঠি বেছে কিনে নিলাম। আর কেউ কেউ কিনলো জলের পাত্র। গোমুখ থেকে জল আনার উদ্দেশ্যে।
পথের রেশন তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম আগেই। তিনটে ট্রেকের জন্য। যার একভাগের থেকে আবার আটভাগ করে যার যার ভাগ তাকে তাকে দিয়ে দেওয়া হল। রেশনে পাওয়া গেল কাজুবাদাম, কিসমিস আর খেজুর। আর সবার কাছে থাকল নিজেদের প্রয়োজনমতো পানীয় জল।
প্রথমেই একটা চেকপোস্ট পড়ল। অনুমতিপত্র দেখাতে হল। তার সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরার জন্য অনুমতি নিতে হল। আর তার ভাড়া দিতে হল। সঙ্গের পাতলা প্লাস্টিক বাতিল করতে হল। সঙ্গে কতগুলো প্লাস্টিকের জিনিস নিয়ে যাচ্ছি (যেমন বোতল) তার হিসেব দিতে হল। ফেরার সময় হিসেব মিলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পথে ফেলে দিয়ে নোংরা করে রেখে আসা যাবে না।
গোড়াতেই আমরা একটা ভুল করলাম। একটু ঘুরে না গিয়ে উঁচু সিঁড়ির শর্টকাট নিলাম। অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় আর অল্পপথে বেশি পরিশ্রম হল।
যাই হোক, বামদিকের পাহাড় ধরে হাঁটা শুরু করলাম। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে পথ, প্রকৃতি তেমন রুক্ষ নয়, তবে গাছ বিশেষ নেই বলতে গেলেই চলে। যে পাহাড়টা ধরে আমরা চলছিলাম সেটাকে অনেকটা ফ্ল্যাট মাউন্টেন বলা চলে। ডানদিকে খাড়াই নেমে গিয়েছে গঙ্গার কাছে। অন্যপাশে উঠে গেছে আর এক পাহাড়। ওই পাহাড়ে গাছ অপেক্ষাকৃত বেশি।

আমার একটা সমস্যা আছে। ফুটবল খেলায় পাওয়া পুরোনো একটা চোট আছে বামপায়ের কুঁচকিতে। প্রত্যেক ট্রেকের শুরুর দিনে পীড়া দেয় সেটা। এখানেও তাই হল। ৪-৫ কিলোমিটার পরে মনে হল বামপায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। যেন অসাড় হয়ে গেছে পা, আর হাঁটতেই পারবো না। ওই অবস্থায় ব্যথা নিয়েই আরও ৫০০ মিটার যাওয়ার পর আর পারলাম না। বসেই পড়লাম। ভাগ্য ভালো গোটা দলই তখন বিশ্রাম নিতে একটু বসেছে। তাই ওদের আর জানালাম না। জানলো কেবল অসীমা। ও পা ধরে একটু টানাটানি করে দিল। ব্যথা খানিক কমলে আবার শুরু হল যাত্রা। অসীমা আর অভিজিৎদার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হল। তারপর সন্দীপদা আর অনসূয়া। মিঞা- বিবিতে দিব্যি চলেছিল। তাল মিলিয়ে। তারপর রাখী যেন অতনুকে নিয়ে চলছিল। ওদের পর সোমাঞ্জন। আর সবশেষে আমি। ব্যথার সঙ্গে যুদ্ধ করে কচ্ছপগতিতে চলতে হচ্ছিল।

পুরো রাস্তাটাই প্রায় জনমানবশূন্য। শুধু একটু দূরে দূরে কয়েকজনের দেখা মেলে। তারাও যাত্রী। না আছে গ্রাম। না কোনও ঘরবাড়ি, না দোকান। মাঝে মধ্যে একটা করে ঝরনা। সেখান থেকে জল নিয়ে তাতে জিওলিন মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছিল।

তারপর আবার চলা। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হলে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম, বা পাথরের ওপরে বসে পড়ছিলাম সবাই একসঙ্গে। রেশন খাওয়া চলছিল, সঙ্গে জল। বিশ্রাম বেশিক্ষণের নয়। বড়জোর পাঁচ মিনিটের। কারণ বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে নেই। পায়ের পেশী বেশি বিশ্রাম পেয়ে গেলে ক্র্যাম্প হয়ে যাবে। তখন আর হাঁটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। আর একটা কথা হাঁটার সময় যতই ইচ্ছে হোক, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া চলবে না। তাহলে গলা শুকিয়ে যায়। ক্লান্তি আসে তাড়াতাড়ি। তাই ছোটোছোটো করে, কিন্তু নাক দিয়েই, নিঃশ্বাস নিতে হয়।

অতনুর মাঝে মাঝে সামান্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবার সঙ্গে আনা কর্পূরের গন্ধ নেওয়ার পর সে কষ্ট চলেও যাচ্ছিল, আর নতুন উদ্যমে আবার হাঁটছিল। তবে অতনুর প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে রাখীর ভূমিকা যে বিশাল সেটা মানতেই হবে। জিনিসপত্রের সিংহভাগ রাখী একাই বয়ে নিয়ে চলেছিল। সোমাঞ্জনও তাল মিলিয়ে ভালোই যাচ্ছিল। আমিই কেবল ধুঁকতে ধুঁকতে চলছিলাম। কুঁচকির ব্যথা একটু একটু কমতির দিকে থাকলেও ক্রমাগত বাধা দিচ্ছিল।

২০১৩ সালে একটা বড় বন্যা হয়েছিল এই অঞ্চলে। সেই থেকে রাস্তাঘাটের অবস্থা তথৈবচ। আস্তে আস্তে একটু ঢালুর দিকে নামতে থাকলাম। গঙ্গার ওপর একটা কাঠের পোলগোছের ফেলা আছে। এই জায়গাটায় স্রোত অনেকটা হলেও তার গভীরতা বা চওড়া অনেক কম। সাবধানে জায়গাটা পেরোলাম। নামার ফলে পায়ের যে বিশ্রামটা হয়েছিল, একধাক্কায় তার তিনগুণ শ্রম যে কপালে লেখা আছে তা তখনও জানা ছিল না। এবার চড়াই শুরু হল। ভীষণ খাড়া এক চড়াই। প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘায়িত হল সেই চড়াই। মাঝে কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রথম বড় বিশ্রামের জায়গা 'চিরবাসা'।

Pinus roxburghii, হল পাইন গাছের একটা বিশেষ প্রজাতি। এর সাধারণ নাম চিরপাইন। এ গাছের পিতৃপুরুষের বাস তিব্বত ও আফগানিস্তানে। সেখান থেকে জম্মু ও কাশ্মীর ঘুরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, নেপাল, সিকিম, ভুটান, অরুণাচল হয়ে মায়ানমার-এ। এর অন্যান্য ভাইরা (প্রজাতি) দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা পৃথিবীর পার্বত্য অঞ্চল । এ গাছ মোটামুটি ৩০-৫০ মিটার লম্বা হয়। ব্যাসে ২-৩ মিটার। পাতাগুলো সবুজ সূচের মতো দেখতে।

এই চিরপাইনের বাসভূমি হিসাবে জায়গাটার নামকরণ চিরবাসা।
প্রসঙ্গত গঙ্গোত্রী থেকে চিরবাসা ৯ কিমি দূরত্ব। গাছপালা ঘেরা ছোট্ট অঞ্চল। একটা খোলামেলা বিশ্রামস্থল আর খানচারেক ছোটবড় খাবারের দোকান, ব্যস! বিশ্রামের জায়গাটাতে বসার জন্য সিমেন্টের স্ল্যাব বানানো। আর ইতিউতি কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বসার জায়গা। জিনিসপত্রের দাম এখানে আকাশছোঁয়া (MRP-এর আড়াইগুণ)। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে জিনিসপত্র বয়ে আনা যে কী কঠিন তা আমাদের থেকে ভালো আর কে জানে। সবাই চা খেলাম। তারপর আলুর পরোটা টমেটো সস দিয়ে। কেউ কেউ ম্যাগি আর অমলেট । তারপর একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক আর একটা মিল্কশেক। আহারপর্ব শেষ।

চিরবাসাতে মোটামুটি জনসমাগম আছে। দোকানের লোক। গাইড। মাল বয়ে দেওয়ার লোক। ট্যুরিস্ট। সব মিলিয়ে একটু জমাটি ব্যাপার। এর মধ্যেই দেখা গেল একজন জার্মান ট্যুরিস্টকে। সবথেকে কিউট বুকের কাছে তাঁর ছোট্ট বছর তিন-চারেকের বাচ্চা মেয়ে চেস্ট -হাইকিং-ক্যারিয়ারে আবদ্ধ থেকে আপনপমনে খাওয়াদাওয়া আর খেলা করে যাচ্ছিল সারাক্ষণ।
আবার এগোলাম। কখনও চড়াই, কখনও সমতল রাস্তা। এসে পৌঁছলাম সেই বিশেষ জায়গাটাতে যার বিবরণ গুগল থেকে পড়ে, ইউটিউবের ভিডিও দেখে আগেই জেনে এসেছি আমরা। আর সতর্ক হয়ে রয়েছি। কখন আসে !
জায়গাটির নাম 'গিলা-পাহাড়'। নাম শুনেই বোঝা যায় খানিক ব্যাপারটা।
চিরবাসা থেকে ৩ কিমি দুরে এই এলাকাটা আলগা পাথরে পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত ধ্বসপ্রবণ। ২০১৩ সালের বন্যায় এই জায়গাটার ক্ষতি হয় সবথেকে বেশি। এখন এমন অবস্থা যে এই ৪০০/৫০০ মিটার অঞ্চল খুব সন্তর্পণে পেরোতে হয়।

সামান্য কম্পনেও বিরাট ধ্বস নামতে পারে। বিশাল বিশাল পাথরের স্তূপ তৈরি হয়েছে ভীষণরকম আলগাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একের ওপর অন্য পাথর ভর করে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এইখান থেকে শুরু হয়ে গোমুখ পর্যন্ত 'ভরল'-এর বিচরণভূমি। ভরল হল হিমালয়ের দশ হাজার ফুট উচ্চতায় বাস করা এক বিশেষ প্রজাতির ভেড়া। যেখানে সেখানে চরে বেড়ায় আর বড় বাঁকানো শিং দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গোত্তা মারে।

আগেই এই অঞ্চল সম্বন্ধে জেনে এসেছিলাম। তাই সন্তর্পণে কিন্তু একটু দ্রুতপায়ে জায়গাটা পার হওয়ার চেষ্টা করলাম। পেরোনোর পরপরই ওপর থেকে বেশকিছু ছোট বড় পাথর গড়িয়ে পড়ল আর ওপরের দিকে তাকিয়ে যেন ভরল-ই দেখলাম খান দু-তিনেক। যাই হোক তখন জায়গাটা পেরিয়ে গেছি। অগ্রসর হলাম। আর পিছু ফিরে তাকালাম না।

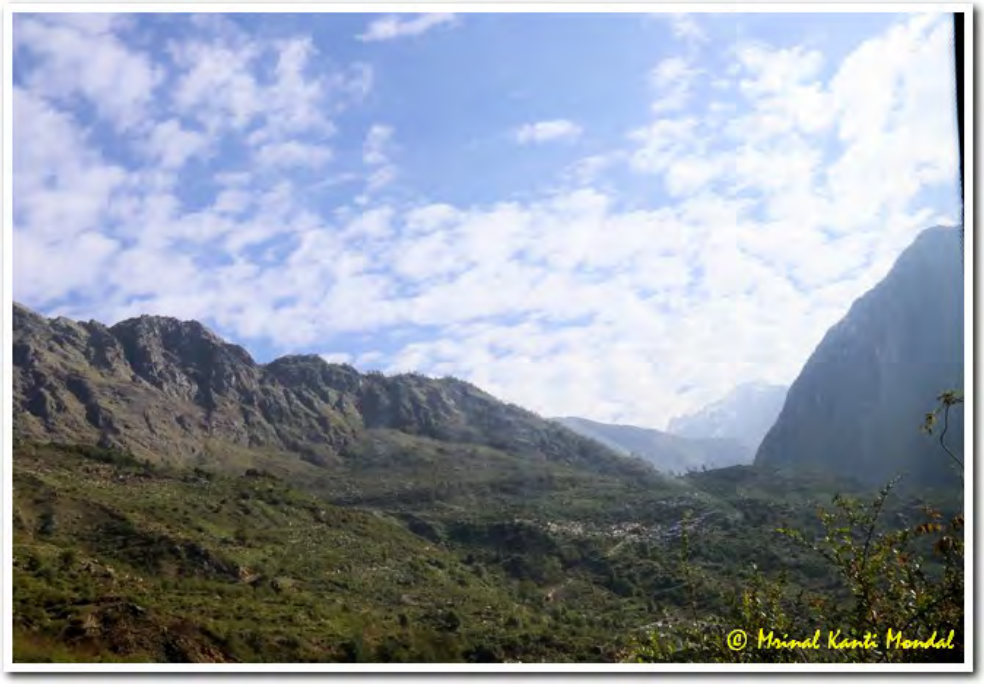

গিলা-পাহাড় থেকে আবার খানিক চড়াই খানিক উৎরাই পেরিয়ে একটা বাঁক ঘুরে সামনে নিচে দেখতে পেলাম ভোজবাসার বিস্তীর্ণ পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা। মোটামুটি বেলা দুটোর মধ্যেই ভোজবাসা পৌঁছে গেলাম আমরা। গিলা-পাহাড় থেকে ভোজবাসা ৪ কিমি পথ।

পৌঁছেই আগে একজায়গায় জিনিসপত্র রেখে ঘরের সন্ধানে বেরোলাম। ঘর এখানে তিনরকমের। মিলিটারির তত্ত্বাবধানে টেন্ট। লালবাবা আশ্রমের খুপড়ি। আর আশ্রমের পিছনের দিকে ছোট ছোট ছাউনি। সব দেখেশুনে লালবাবা আশ্রমের একটা খুপড়ি নেওয়া হল। খুপড়ি তো খুপড়িই। আলোহীন। অনেক নিচু আর স্যাঁতসেঁতে একটা ঘর, মেঝেতে কম্বলপাতা। গায়ে দেওয়ার কম্বল রাখা আছে ঘরের মধ্যেই একটা উঁচুমতন জায়গাতে। সেখানেই ব্যাগপত্তর রাখলাম। টর্চের আলোয় সব গুছিয়ে রেখে বেরোলাম। দরজার অবস্থা খুবই খারাপ। আটকায় না বাইরে থেকে। ঘরের সামনে একটা অন্ধকার গলির মতো। সেই গলির দুপাশে মোট চারখানা খুপড়ি। আর শেষে দুটো বাথরুম। খাবারের ব্যবস্থা আশ্রম কর্তৃপক্ষের। মন্দিরের ঘন্টার ধ্বনি শুনে হাজির হতে হবে ভোজনকক্ষে, সেখানে লম্বা করে ফরাস পাতা। রান্নাঘর থেকে থালা নিয়ে বসে যেতে হবে সার দিয়ে। স্বেচ্ছাসেবকরা সবাইকে খাবার পরিবেশন করবেন। একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে ভোজনকক্ষে গেলাম সবাই। শেষ দলের খাওয়া শুরু হবে তখন। দুপুরের আহারে জুটল ভাত, কলাই-এর ডাল, সয়াবিন-আলুর তরকারি। সাধারণ খাবার, কিন্তু তৃপ্তি লাগল খেতে। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকের সঙ্গে ভালো পরিচয় হয়ে গেল। ফোন নম্বরও নেওয়া হল। ফিরে এসে যোগাযোগও ছিল এদের দুজনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন। খাওয়ার পর এবার এলাকা পরিভ্রমণে বেরোলাম।

উঁচু পাহাড়ে ঘেরা বিশাল উপত্যকা, তার বুক চিরে বয়ে গেছে গঙ্গা (আসলে ভাগীরথী গঙ্গা)। সেই গঙ্গার উজান ধরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করলে উপত্যকার শেষ প্রান্তে ৩ কিমি দূরে গোমুখের কিয়োদংশ দেখা যায়। ঘেরা পাহাড়গুলোর মাথা বরফে ঢাকা। তার ওপর রৌদ্র আর মেঘের লুকোচুরি খেলা। আমাদের ঘরের পিছনের একটা ঘরের সামনে পাথরের ওপর বসেছিলেন পাঁচজন যোগী। তাঁরা পঞ্চকেদার ও চারধাম নাকি পুরোটাই হেঁটে বেড়াচ্ছেন। কেদার থেকে হেঁটেই এসেছেন এখানে। এবার যাবেন তুঙ্গনাথ। বাইরে হালকা বৃষ্টি শুরু হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছিল। কিন্তু ঘরে ঢোকার কোনো

ইচ্ছেই ছিল না আমাদের। আমি, অতনু, সোমাঞ্জন, অসীমা, রাখী একসঙ্গে গঙ্গার পাড়ে আর জলে নেমে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। অভিজিৎদা অদূরেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটু পরে সন্দীপদা আর অনসূয়াও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। মনোরম নয়নাভিরাম অনবদ্য পরিবেশে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলাম প্রকৃতির দিকে। সূর্য ডুবল। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের চূড়ায়, বরফের ওপর। সে এক শোভা বটে। কোনও বর্ণনাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। অনুভবেই তার মাহাত্ম্য। মন্দিরের সন্ধ্যারতি দেখলাম। ঠান্ডা পড়ছিল জাঁকিয়ে। তাড়াতাড়ি আহার সারতে হবে। এখানে ঘরে যে একটা আলোর ব্যবস্থা আছে সেটা নাকি সাতটা-সাড়ে সাতটার পর নিভিয়ে দেওয়া হয়। ভোজনালয়ে গিয়ে রুটি তরকারি সহযোগে রাতের খাবার সারলাম। তারপর স্বেচ্ছাসেবকদের আরও দুটো বালিশ ও একটা গায়ে দেওয়ার কম্বলের আবেদন করে ফিরে এলাম ঘরে। যথাসময়ে বালিশ আর কম্বল চলেও এল। বিছানা করে শুয়ে পড়লাম একসঙ্গে। কম্বলের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে ঢুকতে লাগলো ঠান্ডার আমেজ। সেসব উপেক্ষা করে কখন যে ঘুম এল তার হিসেব নেই। ঘুম ভাঙল মধ্যরাতে। রীতিমতো ভাঙানো হল। আর অসীমা যে কেন ব্যাগ কাছছাড়া করছিল না তার প্রকাশ পেল এবারে।

ভোজবাসায় সেই ঠান্ডার মধ্যে পাগলামি শুরু করল অসীমা। দলের বাকিরাও যে মোটামুটি পরিকল্পনা জানতো না তা নয়। দেখলাম যে কেবল আমিই জানতাম না। স্যুইস রোল কেক কাটতে হল। আমার জন্মদিন পালন হল সেই মাঝরাতেই। দলে আবার একজন স্বেচ্ছাসেবককেও জুটিয়েছিল। তার কাছ থেকে রান্নাঘরের ছুরি ধার নিয়েছিল। উপহারস্বরূপ মিলল সকলের শুভেচ্ছা, অতনু আর সোমাঞ্জনের তরফ থেকে পালস্ লজেন্স, একবাক্স আমুলের চকোলেট (সেই বাক্স আজও আমার কাছে সংরক্ষিত) আর আমার ক্যানন ক্যামেরার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স (১০-১৮ মিমি)। অসীমা যে আবার আমার কলিগ ও বন্ধু অপূর্বকেও জড়িয়েছিল লেন্স কেনার ব্যাপারে সেটা বহুপরে জানতে পেরেছিলাম। সমগ্র পরিকল্পনার মূলচক্রী ছিল অসীমা। কেক, চকোলেট আর লেন্স সেই কলকাতা থেকে বয়ে বয়ে ব্যাগে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ও, তাই ব্যাগ আগলে রাখা। এই জন্মদিনপালন আজও ভুলিনি আর ভুলব বলেও মনে হয় না। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। একেবারে অন্যরকম।

সবাই কেক খেলাম। বাকিটা ওই স্বেচ্ছাসেবককে দিয়ে এলাম। ওঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে খেয়েছিলেন। সবাই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে অবশ্য দু-তিন জনের বাথরুম যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় আমি আর অতনু তাদের সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরোলাম। বাইরের উপত্যকা তখন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। গঙ্গার জল চিকচিক করছে আলো পড়ে। সে আর এক মোহময় পরিবেশ। কিছুক্ষণ সেই ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড ঠান্ডা তখন (৪-৫ ডিগ্রি হবে)। তাছাড়া ভোরে গোমুখের উদ্দেশ্যে বেরোতে হবে। বেলা বেড়ে সূর্যের আলো হিমবাহের ওপর পড়লে বরফের চাঁই-এ ফাটল ধরে। আর বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ড শব্দে বরফের টুকরো গুলির মতো ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার আগেই আমাদের গোমুখ দর্শন শেষ করতে হবে।

ঠান্ডার জন্য হোক আর রাতের অনুষ্ঠানের জন্য হোক উঠতে একটু দেরি হল। তাড়াতাড়ি সকালের কাজ সেরে শীতের পোশাক চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অধিকাংশটাই সমতলভূমি। তাই পৌঁছাতে বেশিক্ষণ লাগলও না।

কিন্তু গোমুখকে একেবারে ওপর থেকে সামনাসামনি দেখতে হলে বড় অথচ আলগা পাথরের চাঁই-এর ওপর দিয়ে অনেকটা এগোতে হবে। অভিজিৎদা, অসীমা আর আমি এগোলাম। দেখাদেখি প্রথমে অতনু আর রাখী, আর পরে আস্তে আস্তে সবাই এগোল। একেবারে খাদের ধারে একটা পাথরের বড় চাঁই-এর ওপর বসলাম। নিচে খাদ। খাদের ভূমি সমতল কাদার। আর তার সামনে বিশাল এক পুরু হিমবাহ। মাত্র ৭০/৮০ মিটার দূরে। আর তার ঠিক নিচে ছোট্ট বরফের গুহার মুখ। এই সেই বহুশ্রুত গোমুখ গুহা। সেখান থেকে বেরোচ্ছে গঙ্গার জলধারা খুবই ছোট নালার আকারে। আর এগিয়ে চলেছে আমাদের ঠিক ডানদিক দিয়ে ভোজবাসার দিকে। তারপর তা ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে।

হিমবাহের সর্বাঙ্গ যে বরফের জন্য শ্বেতশুভ্র, তা কিন্তু নয়। বয়ং গায়ে কাদার প্রলেপ অনেকাংশেই। যেন এক বিরাট যোগী গায়ে ধুলো মেখে ধ্যানমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ। আর হিমবাহের পিছনে ডানদিক ঘেঁষে অনেকটাই উঁকি দিচ্ছে সেই শিবলিং শিখর। পুরোটাই ধবধবে সাদা। যেন বিশাল বড় একটা বরফের চাঁই কেউ আপনখেয়ালে প্রকৃতির মধ্যে আলতো হাতে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

রোদ উঠল, শিবলিং-এর মাথা মেঘে ঢেকে গেল। তারপর শুরু হল বরফের ফাটল। আর কিছুক্ষণ কাটিয়ে নেমে আসতে শুরু করলাম টিলা থেকে। ফাটল তৈরি হওয়ার ও আওয়াজের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল।

যাঁরা তপোবন ট্রেক করেন তাঁদের ভোরবেলা ওই হিমবাহের বরফের ওপর দিয়ে বাঁদিক ঘেঁষে অগ্রসর হতে হয়। আরও সাড়ে চার কিমি ট্রেক করে তপোবন উপত্যকায় পৌঁছানো যায়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৮-এর পর থেকে গোমুখ হিমবাহে অতিরিক্ত ধ্বসের কারণে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ হয়ে তপোবন ট্রেক এখনও অনুমতি দেওয়া হয়না আর। কবে আবার চালু হবে তাও জানা নেই)।
এবার আরেক বিপত্তি ফেরার পথে যেই না সেই আলগা পাথরের ওপর উঠেছি অমনি ডানদিকের পাহাড়ে সেই ভরলের দল এমনি উৎপাত শুরু করল যে ধ্বস নামল পাহাড়ের একটা অংশে। সেই বিপদসঙ্কুল আলগা চাঁই-এর ওপর দিয়ে আরও বেশি পথ ঘুরে নামতে হল।
ভোজবাসা ফিরলাম। লালবাবা আশ্রমের প্রাতঃরাশ চা আর লুচি-তরকারি খেয়ে নিলাম সবাই। আমাদের একদিনের থাকা

ও খাওয়ার জন্য আশ্রমের ধার্য আগের দিনই মেটানো ছিল (লালবাবা আশ্রমে একদিনের সকলরকম খাওয়া, প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজসহ একজনের থাকার খরচ মাত্র সাড়ে তিনশ টাকা নিল)।

দ্রুত সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আশ্রম ও ভোজবাসাকে বিদায় জানিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। মাঝপথে একজায়গায় ড্রাইভার মোমিনকে ফোন করে ফেরার খবর আর সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দিলাম যাতে সে গাড়ি নিয়ে তৈরি থাকে। গঙ্গোত্রী পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজ সেরে আজই আমরা রওনা দেব সোনপ্রয়াগের উদ্দেশ্যে কেদার ট্রেকের জন্য। সেখান থেকে গৌরীকুণ্ড পৌঁছে তবেই ওই ট্রেক শুরু করা যাবে। তাই পা চালালাম। এবার চেনা পথে। আর অধিকাংশই উৎরাই। তাই বেলা বারোটার আগেই পৌঁছে গেলাম গঙ্গোত্রী। সেই রেস্টুরেন্টে সেরে নিলাম আহার। তারপর সমস্ত জিনিসপত্র গোছগাছ করে গাড়িতে উঠে শুরু করলাম পরবর্তী সফর। কেদারের লক্ষ্যে। রাত আটটার আগে যতদূর পৌঁছনো যায়।

~ ক্রমশঃ ~

~ গঙ্গোত্রী-গোমুখ ট্রেকরুট ম্যাপ ~ গঙ্গোত্রী - গোমুখের আরও ছবি ~

হাওড়া জেলার অঙ্কুরহাটি কিবরিয়া গাজি উচ্চবিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক মৃণাল মণ্ডলের নেশা ভ্রমণ, খেলাধূলা ও সাহিত্য চর্চা।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

অমরনাথ দর্শন

নিবেদিতা কবিরাজ

~ অমরনাথ-এর তথ্য || অমরনাথের ছবি || অমরনাথ ট্রেকরুট ম্যাপ ~

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

একটু এগোতেই পিট্টুদের সঙ্গে দেখা, একজনকে আমার আর মামার বড়ো ব্যাগ দুটো দিয়ে হালকা হলাম, ছোট ব্যাগটা পিঠে নিয়ে চললাম। আজকের বারো কিলোমিটারের প্রথম তিন কিলোমিটার খুব চড়াই পথ, উঠতে পারলেই পিসু টপ। ওটা পেরোতে পারলে বাকিটা কঠিন নয়, চড়াই উৎরাই দিয়ে সাজানো। যাত্রা শুরু করার একটু পরই একটা ভাণ্ডারা পেলাম, মান্টামামা হালকা খাবার খেল ; মৃণাল বলল, "দিদি খেও না, পিসু টপ পেরোই, তারপর ভাণ্ডারা পাবো তখন খাবো।" এগিয়ে চললাম। খাড়াই মানে ভীষণ খাড়াই, তার মধ্যে কাদা, দলের কাউকে দেখা যাচ্ছে না, সবাই নিজের মতো এগোচ্ছে, আমি আর মামা একসঙ্গে উঠছি, পাশ দিয়ে ঘোড়ার লাইন উঠছে। দু পা এগোচ্ছি আর একটু দাঁড়াচ্ছি, নিজেকে বোঝাচ্ছি কোনও তাড়া নেই, কচ্ছপের মতো ওঠো, উঠতে তোমায় হবেই। ঘন্টা তিনেক এভাবে হাঁটার পর ভাবছি এখনও তিন কিলোমিটার হয়নি? কতটা হল? আর কত বাকি? এক ঘোড়াওলাকে জিজ্ঞেস করায় বলল আর এক কিলোমিটার, দূরে হাত দেখিয়ে বলল, "ওই যে পিসু টপ দেখা যাচ্ছে, হয়ে যাবে দিদি, ধীরে ধীরে আসুন।" বেলা এগারোটার দিকে আর আমি দুর্গম, দুরূহ পিসু টপ পৌঁছলাম। মৃণালরা আর মান্টামামা আগেই পৌঁছে গেছে, মান্টামামা তো হিরো, সবার আগে পৌঁছেছে। সবাই ভাণ্ডারার সামনে আমাদের জন্যই অপেক্ষায় ছিল, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করলাম যে যার পছন্দ অনুযায়ী; কেউ রুটি, কেউ ইডলি, কেউ পোহা। একটা রুটি আর একটু সবজি নিলাম, শেষে একটু চা। "বেশিক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যাবে না, নিলে শরীর ছেড়ে দেবে, এখনও ন'-দশ কিলোমিটার, চলো বেরিয়ে পড়ি দিদি", মৃণাল তাড়া লাগাল।

এরপর জোজিবাল, নাগাকোটি পেরোলাম। চড়াই উৎরাই পথে হাঁটতে হাঁটতে কোথাও দু'দণ্ড দাঁড়াচ্ছি, কখনও পাথরের ওপর একটু বসছি, কখনও দুটো খেজুর, কখনও বা এক ঢোক জল খেয়ে আবার হাঁটছি। রুক্ষতাও এমন সুন্দর, গাছপালাহীন মাটি নুড়ি পাথর দিয়ে সাজানোগোছানো - পর্বতের সৌন্দর্য যেন সেই পরমাত্মার হাতের রঙতুলির কারুকার্য, কোনও এক মুহূর্তের খামখেয়ালিপনা। এসব দেখতে দেখতে কত রাস্তা হেঁটে চলেছি, কিন্তু একটুও কষ্ট নেই, যেন এক পরম আনন্দ।

এভাবে চলতে চলতে হঠাৎই প্রচন্ড গর্জন করে পাশ দিয়ে বয়ে যেতে দেখলাম শেষনাগ থেকে নির্গত জলরাশিকে। বুঝলাম আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। শুনেছি বাবা মহাদেব এখানেই নাকি শেষনাগকে রেখে উঠেছিলেন। জয় মহাদেবের জয়। আবার বেশ খাড়াই শেষ দিকটা, নাকি পথের ক্লান্তিতে খাড়াই লাগছিল জানিনা, মিলিটারি ড্রেস পরা দুই অল্পবয়সী মহিলা ওপর থেকে নেমে আসছেন সাহায্য লাগবে কিনা জানতে, হাসলাম, হাতটা ধরলেন। ওঁদের একজনের হাত ধরে বাকি দশ পা মতন তরতর করে উঠে শেষনাগ পৌঁছে গেলাম। আসার সময় বলেছিলাম আমার হাত ধরে তুলতে, উনি শুনেছেন। অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতা, আর এক বোধোদয় একই সঙ্গে ঘিরে ধরল আমায় ; উপলব্ধি করলাম তিনি শুধু মন্দিরে মসজিদে নয়, সর্বত্র বিরাজমান।

শেষনাগে একটা টেন্টে মৃণালরা পাঁচজন আর আমরা তিনজন - এই আটজন থাকব আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, সেইমতো ঢুকে পড়লাম টেন্টে। একটা প্লাস্টিক ফোম পাতা, তার ওপর কম্বল দেওয়া; তাতেই শুতে হবে, আর গায়ে দেওয়ার একটা করে কম্বল। বেশ ঠান্ডা এখানে, ঠিক হল ভাণ্ডারা থেকে যে যা খাবো খেয়ে চটপট কম্বলের তলায় ঢুকে যাব। রীতিমতো ঠকঠক করে কাঁপছি, একই হাল সবার। ওরকম কাঁপতে কাঁপতেই খেয়ে এসে জ্যাকেট, টুপি যে যা পরে ছিলাম ওই পরেই শুয়ে পড়লাম।

১৩ জুলাই, ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়লাম শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণীর পথে। রাস্তায় ভাণ্ডারা থেকে এক কাপ চা খেয়ে নিলাম শুধু। শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণী প্রায় পনেরো কিলোমিটার, প্রথম সাড়ে চার কিলোমিটার শুধু চড়াই আর রুক্ষতা, অক্সিজেনের অভাব।

আজ হেঁটে উঠতে মামার একটু কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, মামার সঙ্গে সঙ্গে আছে মানস। বারবার দাঁড়িয়ে দম নিতে হচ্ছে। মামাকে কোকা-৩০ দিলাম, বলল, "ঠিক আছি চল।" অনেক দূরে মহাগুনাস টপ দেখা যাচ্ছে, বলেই ফেললাম, "অত ওপরে এখনও উঠতে হবে?" মামা বলল, "ওদিকে দেখিস না, নিচের দিকে তাকা, কত মানুষ উঠে আসছে, তুই ওই পথ পেরিয়ে এসেছিস।" অবাক হয়ে গেলাম, পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে মানুষগুলোকে, ওই পথেই এসেছি? তিয়াত্তর বছরের মামার মনের জোর দেখে অবাক হলাম। বেড়ে গেল মনের জোর, মনে হল, হ্যাঁ পারব, ঠিক পারব, পারলামও। মহাগুনাস টপে পৌঁছনোর একটু আগে থেকে বৃষ্টি শুরু হল, হাঁটার গতিও কমে গেছে। কথিত আছে, এখানেই মহাদেব পুত্র গণেশকে রেখে মাতা পার্বতীকে নিয়ে ওপরে উঠেছিলেন।

টুক টুক করে হেঁটে পৌষপত্রীর ভাণ্ডারাতে দাঁড়ালাম সবাই। এই ভাণ্ডারাটায় দেখলাম দারুণ দারুণ সব খাবার ; আমরা টুকটাক খেয়ে, একটু বসে আবার হাঁটা শুরু করলাম। এবার উৎরাই বেশি, চড়াই কম। কিন্তু বৃষ্টিতে রাস্তা কাদা হওয়ায় নামাও যেন শক্ত হয়ে গেল। এবারে মৃণাল আমার হাত ধরল, তাতে যেন নামাটা সহজ হল। শুধু হাঁটা না, মৃণাল আমায় পাহাড়ি পথে নামতে শেখালো। মনে মনে বুঝলাম তিনিই এসে ঠিক হাত ধরলেন। যখনই অসুবিধে হয় মৃণাল ঠিক হাতটা ধরে নামিয়ে দিচ্ছে। আবার উপলব্ধি করলাম তিনি মানুষের মধ্যেই আছেন; জানি না কতটা পাথরের বা ধাতুর মূর্তিতে আছেন, তবে জীবের মধ্যে যে আছেন তা তো নিজের চোখেই দেখলাম। বইয়ে পড়েছি, শুনেছি কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভব এই যাত্রায় হল।

পঞ্চতরণীতে পৌঁছতে বেশ দেরি হল, সন্ধে নামে নামে, মানে আটটা বেজে গেছে। আজ পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নার আলোয় দুধসাদা বরফের পাহাড় যেন সোনায় মাখামাখি। এক মায়াবী রাতে আমরা তোমার অপার্থিব স্বর্গরাজ্যে।

ভাণ্ডারাতে একটা রুটি, ডাল আর সিমুই খেলাম। টেন্টে ফেরার পর মৃণালের বন্ধু সন্দীপ বলল, "দিদি, কাল আমরা অমরনাথ দর্শন করে নিচে নেমে যাব, তাই শুরুতেই ঘোড়া নেব। আপনারা কী করবেন?"

আমরা তিনজন হেঁটেই উঠব ঠিক করলাম, ঘোড়া নিতে হলে অমরনাথ গুহা থেকে বেরিয়ে মানে বরফিনাথ দর্শনের পর নেব।

১৪ জুলাই ভোর চারটে, আবার বেরিয়ে পড়লাম, পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে।

পঞ্চতরণী থেকে গুহার দূরত্ব ৬ কিলোমিটার, কিন্তু দুর্গম রাস্তা। ক'দিন আগের মেঘভাঙা বৃষ্টির পর আরও খারাপ হয়েছে। দর্শন করেই বালতাল নেমে যাওয়ার ইচ্ছা, অমরনাথ গুহা থেকে বালতাল চৌদ্দ কিলোমিটার, অনেকটা রাস্তা। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লেও পঞ্চতরণীর গেট খুলল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। হাঁটা শুরু করলাম মনের আনন্দে, আজই দর্শন করব প্রভু তোমার ওই অভূতপূর্ব রূপ।

আজ আকাশ বড়ই মুখ ভার করে রেখেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হ'ল, রেনকোট পরে হেঁটে চলেছি। বৃষ্টির বেগও বাড়ছে, মামাও বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হেঁটে চলেছে; বারবার মামার দিকে দেখছি, বৃষ্টিতে ভিজছে এভাবে, কী হবে কে জানে! আজ যেন একটু ভয় ভয় করছে, রাস্তারও ভয়ানক অবস্থা, মানুষের সংখ্যাও প্রচুর, খাড়াই সরু পথে তিন চারটে লাইন, তার মধ্যে ঘোড়া, পালকি যাতায়াত করছে, পা টিপে টিপে যেতে হচ্ছে।
আমার ভেতরে তুমি আছো তো, সেই তুমি শক্তি দাও, তুমি সঙ্গে থাকলে ঠিক পারব, তাঁকে ডাকতে ডাকতে চলেছি। মাঝে মাঝে এত উঁচু উঁচু পাথর যে একা উঠতেই পারছি না, পাশ থেকে একজন হিন্দিতে বলল, "হাতটা দিন"। হাত ধরতেই টপ করে উঠে পড়লাম, হেসে বললাম, "ভাগ্যি ছিলেন।" উনি বললেন, "আছি, চলুন ভয় নেই।" বার বার উনি হাত ধরছেন আমি না বললেও, অবাক হচ্ছি খুব, পিছন থেকে একজন বললেন, "মাতাজী ভয় নেই, হাত ধরুন, বরফে পা পিছলে যাবে।" কে বলছেন? আমার ঈশ্বর? সত্যিই পা ভীষণ পিছলে যাচ্ছে, শক্ত করে মানুষটার হাত ধরলাম, বুঝলাম তিনিই নিয়ে যাচ্ছেন। যাত্রীদের প্রত্যেকের হাতেই একটা করে লাঠি, লাঠি ছাড়া আগে কাউকে দেখিনি বা হয়তো লক্ষ্য করিনি। এই মানুষটার হাতে লাঠি নেই, আমাকে বেশ কিছুক্ষণ শক্ত করে ধরে অনেকটা পথ পার করলেন, মামাকেও অনেক জায়গায় টেনে তুলে দিলেন, কখন কখনও মান্টামামাকে হাত বাড়িয়ে পিছলে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেন। হ্যাঁ ইনিই আমার ঈশ্বর, আমার শ্রীকৃষ্ণ, আমার মহাদেব। এভাবে সঙ্গম পেরোলাম, আরও ৩ কিলোমিটার যেতে হবে। বালতাল আর চন্দনওয়াড়ির রাস্তা সঙ্গমে এসে এক হয়েছে, তাই যাত্রী সংখ্যা এবার আরও বেশি। বৃষ্টি মাথায় এক হাতে লাঠি আর একটা হাতে তাঁকে ধরে এগোচ্ছি আর মনে মনে তাঁকে বলছি, "আমি কিন্তু তোমায় টের পাচ্ছি, তুমি ঠিক রক্ষা করলে। আমার, সবার চারিদিকে তুমি আছো, ঘিরে আছো। তুমি গুহাতে যতই থাকো তার থেকে বহুগুণ বেশি মানুষের মধ্যে আছো। ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে আমার, প্রতি মুহূর্তেই ঈশ্বর দর্শন করি তো, কিন্তু বুঝি না বলো। গুহা পর্যন্ত যদি পৌঁছতে না পারি আমার একটুও দুঃখ হবে না, তোমার ওই রূপ যদি দেখতে না পাই তবুও একবারও কোনো অভিযোগ করব না তোমায়, আমি তোমায় অনুভব করতে পেরেছি এতেই অপার আনন্দ আজ আমার বুকে।" এভাবেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন পৌঁছে গেছি গুহার কাছাকাছি, কিন্তু মামাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন কে জানে! অপেক্ষায় এক ধারে দাঁড়িয়ে পড়লাম, একজন মিলিটারি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে?" বললাম মামাদের দেখতে পাচ্ছি না, উনি হাত ধরে একটু উঁচু পাথরে দাঁড় করালেন, বললেন কিছুক্ষণ দেখুন, না পেলে মাইকে নাম ধরে ডাকবেন। মিনিট দশেক পরে দেখলাম মামা আর মান্টামামা উঠে আসছে, আমি মিলিটারি মানুষটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঁচু পাথর থেকে নেমে এলাম আর বুঝলাম আবার তিনিই এসে রক্ষা করলেন।
যাত্রাপথে বহু মানুষ পাশের জনকে এভাবেই হাত ধরে রক্ষা করছেন, দেখেছি আর উপলব্ধি করেছি মানুষের মধ্যে তিনি যতটা আছেন আর কোথাও তিনি এভাবে নেই।

প্রায় তিনশো সিঁড়ি পেরিয়ে পৌঁছলাম গুহার সামনে, মনে হলো যেন অসাধ্য সাধন করলাম। অবশ্য আমি নয়, এ আমার ভেতরের তিনিই করেছেন, ঝরঝর করে আনন্দাশ্রু আমার গাল বেয়ে। বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে, চারিদিক বেশ ঝকঝক করছে, গুহার ওপরের দিকে তাকাতেই নজরে এলো সেই পায়রা, যারা নাকি অমর হয়ে রয়েছে মহাদেবের গল্প শুনে। গেট পেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে একদম সামনের সারিতে চলে এলাম, কী করে এলাম জানি না, চোখের সামনে সেই বিস্ময়কর বরফের শিবলিঙ্গ। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ, টের পেলাম মনের ভেতরটা খুব শান্ত হচ্ছে, ওই বরফের মতোই, আজ খুব পরিতৃপ্ত আমি। এক গভীর ভালোলাগায় ডুবে আছি।
দর্শনার্থীদের ভিড়েই বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে, আমি না বেরোলে আরেকজন ঢুকবে কী করে? শান্তমনে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে।
এবার ফেরার পালা, তার আগে পেটে কিছু দিতে হবে, ভাণ্ডারাতে রুটি সবজি খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গমে নেমে এলাম, ওখানেই পিট্টু অপেক্ষা করছে আমাদের ব্যাগ নিয়ে।
এরপর আমি আর মামা ঘোড়া নিলাম বালতাল যাওয়ার জন্য, মান্টামামা হেঁটে নামতে শুরু করল, ঘোড়া নেবে না।

বালতালের রাস্তা দিয়ে হেঁটে নামা ভালো ঘোড়ায় চড়ে নামার থেকে, কিন্তু শরীর আর দিচ্ছে না, অনেকটা পথ চৌদ্দ কিলোমিটার, হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। হয়তো রাতটা গুহার কাছে টেন্টে থাকতে পারতাম, কিন্তু মনে হয়েছিল যত কষ্টই হোক আজ নেমে যাব বালতাল। ঘোড়ায় যেতে যেতে মান্টামামার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, একা একা নামবে বড়ো ব্যাগটা নিয়ে, বড্ড জেদি মানুষটা। কতবার বলেছি, "জানি তুমি পারবে, তাও ঘোড়া নিয়ে নাও।" নিলো না, বলল, "তোদের আগে নেমে যাবো।" ঘোড়ায় যেতে যেতে একবার আমি আর একবার মামা পড়ে গেলাম, নেহাত খাদের দিকে নয়, তাই প্রাণে বাঁচলাম। এক চুল এদিক ওদিক হ'লেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। আবারও তাঁকে অনুভব করলাম, এবারেও তিনিই রক্ষা করলেন।

ঘোড়া পৌঁছে দিল সাড়ে সাতটার দিকে, সময় নষ্ট না করে চটপট একটা টেন্ট নিয়ে ঢুকে পড়লাম। মান্টামামা নটায়, মৃণালরা প্রায় দশটায় বালতাল পৌঁছেছে। কিন্তু মৃণাল ফোন করায় বুঝতে পারলাম আমি আর মামা বালতাল বেসক্যাম্প-এর আগের ক্যাম্পে ঢুকেছি। মান্টামামা আর মৃণালরা বালতাল বেসক্যাম্পে আর আমরা দুজন অন্য ক্যাম্পে রাত কাটালাম।

ভোর হতেই ক্যাম্পের গাড়িতে মামা আর আমি পৌঁছে গেলাম বালতাল বেসক্যাম্প, ওখানে একটা ভাণ্ডারাতে চা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে মান্টামামাকে নিয়ে তিনজন চললাম বাসস্ট্যাণ্ডে। খোঁজাখুঁজি করে একটা শেয়ার গাড়ি পেয়ে গেলাম, দুপুরেই পৌঁছে গেলাম শ্রীনগর।

শ্রীনগরে হোটেলে ঢুকে আগে স্নান সারলাম, গত তিনদিন স্নান করা তো দূরের কথা, এক জামাকাপড়েই ছিলাম। তারপর তিনজনে একটা বাঙালি হোটেলে ভালো করে খেয়ে লম্বা ঘুম। একটা গোটা দিন কোথাও না বেরিয়ে রেস্ট নিলাম, রাতে মোনাদার ফোন। খোঁজখবর নিলেন, শরীর ঠিক আছে কিনা, কেমন দর্শন হল, পুরোটা হেঁটে গেছি, নাকি ঘোড়ায়। আমি কৃষ্ণাদি, রীনাদির খবর নিলাম, ওঁদের সঙ্গে পঞ্চতরণীতে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল, তারপর আর যোগাযোগ করতে পারিনি। অবশ্য ফোনে পাবই বা কী করে, ফোনগুলো তো তিনদিন চার্জ দিতেই পারিনি, ওঁরাও তাই, ওইজন্য স্যুইচড অফ ছিল। মোনাদাকে আবার গাড়ির জন্য বললাম, যদি দিতে পারেন তাহলে কাল যুসমার্গটা ঘুরে আসতাম। বললেন, "দেখছি, কাল সকালে জানাবো।"

১৭ জুলাই, সকাল সকাল তৈরি হয়ে গেছি, কিন্তু মোনাদা কিছুই জানাননি। ঠিক করলাম নিজেরাই বেরিয়ে পড়ব, বাইরে ব্রেকফাস্ট করে স্ট্যাণ্ড থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব। ব্রেকফাস্ট করতে করতে মোনাদার ফোন, বললেন "গাড়ি নিয়ে আসছি, সঙ্গে রীনাদি, কৃষ্ণাদিকে নিয়ে, ওঁদেরকে নিয়ে আপনারা ঘুরে আসুন।" বাহ্, বেশ খবর! আমরা খুব খুশি। দিদিদের নিয়ে হইহই করে আমরা সারাদিন ধরে যুসমার্গটা ঘুরে নিলাম, সন্ধেতে ফিরে দিদিদের নিয়ে ডাল লেকে শিকারা ভ্রমণও হল।

১৮ জুলাই আমাদের ফেরার ট্রেন। কাশ্মীর, পাহাড়, জঙ্গল, ঝরনা, দুর্গম পথ, অমরনাথ দর্শন, কত অচেনা মানুষের সঙ্গে পরিচয়, কত অজানাকে জানা, বোঝা এভাবেই সমৃদ্ধ হলাম আর সেই রেশ নিয়ে ফিরতি পথে হিমগিরিতে উঠলাম, কী করে যেন কেটে গেল দিনগুলো।

~ *অমরনাথ-এর তথ্য* || *অমরনাথের ছবি* || *অমরনাথ ট্রেকরুট ম্যাপ* ~

নৈহাটিতে, পরিবারের সঙ্গে গাছ, মাছ, পাখি ও কুকুর নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন নিবেদিতা কবিরাজ। প্রিয় একটি বুটিক আছে। প্রকৃতির টানে জঙ্গলের গভীরতায়, পাহাড়ের প্রাচুর্য আর উদারতার হাতছানিতে নিজেকে মিশিয়ে দিতে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়েন এদিক সেদিক।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

টিউবিংগেন আর বেবেনহাউসেন

কণাদ চৌধুরী

ভারত থেকে পশ্চিমমুখে পাড়ি জমায় যে সব বিমান, তাদের সিংহভাগই ভারতের মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ে ভারতীয় সময় মধ্যরাত্রে বা তার কিছু পরে। সিটবেল্ট খুলে রাখার ঘোষণাটা হয়ে যাওয়ার পরেই কেবিনের আলো নিভে যায়, অনেক মানুষ আছেন যারা যে কোনও অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ার মতো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, সেই ভাগ্যবান যাত্রীরা চোখের ওপর কালো পট্টি বেঁধে ঘুমিয়ে পড়েন। অনেকে আবার কীভাবে ঘুম আসবে, সেই চিন্তা করতে করতেই পুরো রাস্তাটা নিদ্রাহীন কাটিয়ে দেন। মাঝরাতে খাবার-টাবার পরিবেশন করার প্রয়োজন হয় না, তাই 'রিফ্রেশমেন্ট উইল বি সার্ভড' জাতীয় ঘোষণাও বন্ধ থাকে তখন। যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধায়িকারা মাঝেসাঝে দু-একজনের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে বিমানের এমাথা থেকে ওমাথা যাতায়াত করেন বটে, কিন্তু সেটুকু ছাড়া বিমানসেবিকাদের কর্মতৎপরতা সাধারণত সেসময় কিছুটা স্তিমিতই থাকে। বিমানের ইঞ্জিন থেকে ভেসে আসা ভ্রমরগুঞ্জনের মতো একটানা মৃদু আওয়াজটুকু বাদ দিলে প্রায়ান্ধকার কেবিন তখন প্রায় নিঃশব্দই থাকে। এরোপ্লেনে জানলার পাশের আসনটায় বসতে পারলে বাহনটা যে চলমান সেটা যদিবা একটু বোঝা যায়, কিন্তু দুই প্যাসেজের মধ্যবর্তী আসনের সারিতে বসার ব্যবস্থা হলে মনে হয় একটা বিশাল ধাতব কৌটোর মধ্যে আমাকে কেউ বন্ধ করে রেখেছে; এগোচ্ছিও না, পিছোচ্ছিও না; অন্তহীন সময় ধরে যেন আমাকে মহাশূন্যে নট-নড়নচড়ন অবস্থায় ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

দীর্ঘ আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রায় শশী থারুর বর্ণিত ক্যাটল-ক্লাসে আমার মতো লম্বা মানুষের একটা প্রধান অসুবিধা হল, সারাটা রাস্তা হাঁটুজোড়া সামনে উপবিষ্ট যাত্রীর হেলিয়ে দেওয়া আসনের পেছনে গুঁতো খেতে থাকে, শরীরটাকে নানাভাবে ভাঁজ করে রাখার কসরত করতে করতে দু-চোখের পাতা কিছুতেই আর এক করা যায় না। অগত্যা মাথার ওপরের রিডিং লাইট জ্বেলে কিছুক্ষণ বইপত্র নাড়াচাড়া করে, অথবা সামনের ইন-ফ্লাইট এন্টারটেনমেন্ট সিস্টেমের পর্দায় কিছু উলটোপালটা ছবি দেখে প্রথম এক-দেড় ঘণ্টা কেটে যায় ঠিকই, কিন্তু তারপর থেকেই গ্রাস করে একঘেয়েমি, বিমানের ভিতরের পরিবেশকে তখন একেবারেই একমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যহীন মনে হয়। আসনের সামনে রাখা পর্দায় বিমানের অবস্থান সম্পর্কিত যে সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকে, সেখানে বারবার চোখ রেখে দেখতে ইচ্ছে করে নিজের গন্তব্য আর ঠিক কতটা দূরে। চার বছর আগে শেষবার যে লম্বা বিমানসফরে আসীন হয়েছিলাম, তখন মোবাইলের ক্যামেরায় সামনের সেই পর্দার ছবি তুলে রেখেছিলাম কয়েকটা। দেখছি সেই বছর জুলাই মাসের চার তারিখে ভারতীয় সময় সকাল ছটা নাগাদ আমাদের অবস্থান ছিল লুফতহানসার ফ্রাঙ্কফুর্টগামী ফ্লাইট নম্বর এলএইচ৭৫৭ বিমানের অভ্যন্তরে। স্ক্রিনে ফুটে ওঠা বিমানের জিপিএস কো-অর্ডিনেটের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের মান থেকে বুঝতে পারছি সেই সময় বিমানের অবস্থান ছিল তুর্কমেনিস্থানের আকাশে, তখনও আরও প্রায় সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা আকাশপথে অতিবাহিত করার পরে তবেই বিমান ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে জার্মানির মাটি ছোঁবে। তারপরে আমাদের চারজনের দলটা ফ্রাঙ্কফুর্টে ছাড়িয়ে রেলপথে আরও এগিয়ে যাবে জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, সেখানে জার্মানির অন্যতম প্রধান শহর স্টুটগার্টের অনতিদূরে শহরতলি বোবলিংগেনে পৌঁছে তবেই আমাদের যাত্রা হবে শেষ, এবং শুরু হবে ভ্রমণ।

চার বছর আগে আমাদের সেই জার্মানি সফর ছিল এক হৃদয়জুড়ানো সুখানুভূতিতে পরিপূর্ণ। প্রবাসে জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং জামাতার বিবাহোত্তর নিজস্ব সংসারে সেটাই ছিল আমাদের প্রথম পদার্পণ। তাদের সংসারযাপনের খণ্ডচিত্রগুলো মোবাইলের মাধ্যমে নিয়মিত দৃষ্টিগোচর হত সেকথা ঠিক, কিন্তু সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে তার পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করার মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ অবশ্যই ছিল। আর একটা কারণ, এটা ছিল সেই বিরলের মধ্যে বিরলতম একটা দেশভ্রমণ, যেখানে আসা-যাওয়ার টিকিট কাটা, প্রয়োজনীয় ভিসা আর ইনসিওরেন্স ইত্যাদি করানোর ঝামেলাটুকু বাদ দিলে সফরের আনুষাঙ্গিক পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ নিয়ে আমাকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হয়নি। জার্মানিতে কন্যার প্রবাসজীবন তখন মাত্র বছর-দুয়েকের পুরোনো, কিন্তু সেই অল্প সময়েই সে তার স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছে বিস্তর, ইউরোপ ভ্রমণের প্রচুর অভিজ্ঞতা ততদিনে সঞ্চিত হয়েছে তাদের দুজনের ঝোলায়। জামাই তো বটেই, মেয়েও তখন বেশ পোক্ত ভ্রামণিক। তারা উভয়ে মিলে আমাদের ঘুরে বেড়ানোর রূপরেখাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ছকে নিয়েছিল আমরা উপস্থিত হওয়ার আগেই। কাজেই আমরা নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায়, নিঃশঙ্কচিত্তে শুধু তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেরিয়েছি, তারা ডানদিকে যেতে বললে

অব্যাহতি মেলে। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে আমার জন্যে এই বেড়ানোটা ছিল একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে যখন সলতে পাকানোর কাজটা চলছে, তখন সে দেশ থেকে মেয়ে ফোনে বারবার জিগেস করত যে আমরা কোথায় কোথায় ঘুরতে যেতে চাই। আগেই ঠিক করেছিলাম, যদি কোনোদিন ওদিকে যাওয়া হয়, তাহলে এমন কিছু দেখতে চাইব না যা মনকে ক্লিষ্ট এবং সংক্ষুব্ধ করে তোলে। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ জীবনে খুব বেশি জোটেনি, তাই বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও খুবই সীমিত। ভেবেছিলাম, পয়সা খরচা করে সামান্য কটা দিনের জন্যে বিদেশ ঘুরতে গেলে যা চোখকে তৃপ্তি দেয় এবং মনকে আনন্দদান করে, সেইরকম কিছু দ্রষ্টব্যের দিকেই দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখাটা বাঞ্ছনীয় হবে। তাই হিটলার, হলোকস্ট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কন্সেনট্রেশন ক্যাম্প এই সব মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলা ঐতিহাসিক স্মারক দেখার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না, মনে হয়েছিল তার চাইতে বরং প্রকৃতি, শিল্প-সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যের ওপর মনোনিবেশ করাই ভালো। এই ভাবনার মধ্যে যৌক্তিকতা কতটা ছিল জানি না, তবে মেয়ে এবং জামাতা সফরসূচিটা সাজিয়েছিল আমাদের এই ইচ্ছের কথা মাথায় রেখেই। এর আগে যখন স্ক্যান্ডিনেভিয়া ঘুরতে এসেছিলাম, সেবার পুরো বেড়ানোটাই ছিল ভ্রমণ সংস্থার আয়োজনের অধীনে। কিন্তু এই সফরে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলোর সবটাই নিজেদের পরিকল্পনায় এবং হাতে একটু সময় নিয়ে ঘুরে দেখা হয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পায়ে হেঁটে আর স্থানীয় গণ-পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। ভ্রমণ-সংস্থার বাসে চড়ে তাদের পথনির্দেশকের নির্ধারিত বাঁধাধরা পথে এবং সময়ের নিগড়ে আটকে থাকা ঝাঁকিদর্শনকে সম্পূর্ণ পরিহার করার ফলে ওইসব দর্শনীয় স্থানগুলোতে আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দুগুলো তো বটেই, তাছাড়াও সেখানকার সাধারণ বাড়ি-ঘর, বাজার-হাট বা রাস্তা-ঘাটগুলোর একটু কাছাকাছি পৌঁছানোর সুযোগ হয়েছিল। ইউরোপের তিনটে দেশের তিনটে বড়ো শহর – প্রাহা ওরফে প্রাগ, ভিয়েনা এবং ব্রুসেলস্ ছাড়াও দিনে-দিনের সফরে মেয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিল বোবলিংগেনের কাছাকাছি বেশ কয়েকটা আকর্ষণীয় জায়গা, ভারতীয় পর্যটকদের অনেকেই যেসব জায়গার নামের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন। সেইরকমই দুটো জায়গা ছিল টিউবিংগেন এবং বেবেনহাউসেন।

জার্মানিতে পা রাখার পরের দিনই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা হাতে বেরিয়ে পরা গেল রাস্তায়। আমাগো দ্যাশের মতো আকাশভাঙা, জনজীবন অচল করা ধারাবর্ষণ এখানে হয় কি না জানা নেই, তবে এই টাপুরটুপুর ইলিশেগুঁড়ি বৃষ্টিকে এদেশে কেউ খুব একটা পরোয়া করে না। যে জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া হয়েছিল, তার নাম Tübingen, বা টিউবিংগেন। স্টুটগার্টের কাছেই এক শহরতলি বোবলিংগেনে মেয়ে-জামাইয়ের বাসস্থান – সেখান থেকে দু-তিন স্টেশন দূরে হেরেনবার্গ (Herrenberg)। হেরেনবার্গ থেকে ট্রেন বদল করে নেকার নদীর ধারে অবস্থিত টিউবিংগেন পৌঁছতে সময় লাগল প্রায় আধ-ঘণ্টা। জার্মান সংস্কৃতিতে একটা প্রবাদপ্রতিম কথা আছে 'Ordnung muss sein' – ইংরেজিতে যার অর্থ 'দেয়ার মাস্ট বি অর্ডার'। জীবনে 'অর্ডার', মানে নিয়ম-শৃঙ্খলার এর অভাব ঘটলে জার্মানরা বড়ই অসহায় এবং বিচলিত বোধ করেন, তাই দেখা গেল এখানে রাস্তাঘাটে সেই 'অর্ডার'-এর ছড়াছড়ি। বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে আমরা এসেছি, সেখানে আবার 'অর্ডার'-এর অনুপস্থিতিটাই স্বাভাবিক, তাই প্রথম দিন পথে নেমে পদেপদেই অনুভূত হল জনজীবনে সেই বিশ্বখ্যাত জার্মান নিয়মানুবর্তিতা এবং সুশৃঙ্খলা। সময় মেনে বাস আসছে, ট্রেন চলছে, কোনও হুড়োহুড়ি বা ঠেলাঠেলি নেই, লোকজন লাইন দিয়ে ওঠানামা করছে নিঃশব্দে, এমনকি ট্রেনে উঠেছে যে পোষা সারমেয়গুলো, তারা পর্যন্ত রীতিমত সুশিক্ষিত, একবারের জন্যেও তাদের কাউকে ঘেউ-ঘেউ করতে শুনলাম না। আর অফিস-টাইমের বনগাঁ লোকালে চড়া বাঙাল আমরা, এখানকার লাল-নীল-হলুদ রঙের আপাদমস্তক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ট্রেনের চেহারা দেখে প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চাইছিলাম না যে এগুলো লোকাল ট্রেন। ট্রেনের জানলার অতবড় কাঁচগুলোতে আঁচড়ের দাগ নেই, দুপাশে পুরু ধুলোর আস্তরণ নেই, কামরার দেওয়ালে কোচিং সেন্টার অথবা হেকিমি দাওয়াইয়ের বিজ্ঞাপন সাঁটা নেই, আর পানের পিক বা গুটখার দাগটাগ তো একেবারেই নেই। তারপর যখন শুনলাম এখানে ট্রেনের কামরায় জোরে জোরে কথা বলা বারণ, তখন মনে হল "ইয়ে কাঁহা আ গয়ে হম!"
স্টুটগার্ট থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত ছোট্ট শহর টিউবিংগেনের ইতিহাস প্রায় এগারোশো বছরের পুরোনো। এর খ্যাতি মুখ্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, শহরে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই ছাত্র-ছাত্রী। জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান্স কেপলার এবং দার্শনিক হেগেল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের অন্যতম। জার্মানিতে এইসব ছোট শহরগুলোর প্রাচীন অংশ, যাকে বলা হয় Altstadt (জার্মান উচ্চারণে আলস্টাট), তাদের বিন্যাস অনেকটা একই ধাঁচের। সেখানে থাকে একটা উপাসনাগৃহ বা চার্চ, একটা টাউন হল বা Rathaus (জার্মান উচ্চারণে রাটহাউস), পাথরে বাঁধানো রাস্তাঘাট, আর বেশ কিছু কাঠের ফ্রেমে তৈরি বাড়িঘর, যেগুলোর অভ্যন্তরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও বহিরঙ্গের প্রাচীন চেহারাটা সুন্দরভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির অনেক ঐতিহাসিক শহর মিত্রশক্তির বোমার আঘাতে কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টিউবিংগেন সে তুলনায় অক্ষতই ছিল বলা চলে, যার ফলে পুরোনো অংশের চেহারাটা প্রায় অবিকৃত রয়ে গিয়েছে, অনেক পর্যটকই যা দেখতে টিউবিংগেনে ভিড় জমান। পুরোনো শহরের কেন্দ্রস্থলে আছে প্রাচীন সেন্ট জর্জেস কলিজিয়েট চার্চ, আর আছে চারশো বছরেরও বেশি পুরোনো টাউন হল, তার সম্মুখভাগে অলংকৃত স্থাপত্যের অংশ হিসাবে আছে এখনও চালু থাকা একটা 'অ্যাস্ট্রোনমিকাল ক্লক'। এই পুরোনো শহর এলাকার আরও একটা বৈশিষ্ট্য এখানকার 'হাফ-টিমবার হাউস'।

এই বাড়িগুলোর বাইরের এবং ভিতরের দেওয়াল কাঠের ফ্রেমে তৈরি আর ফ্রেমের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশটুকু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইট বা প্লাস্টার দিয়ে ভরাট করা হয়ে থাকে। পুরোনো শহরের সরু সরু পাথরে বাঁধানো আঁকাবাঁকা রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রাচীন রংচঙে বাড়িগুলোর সামনের দিকে কাঠের ফ্রেমের জ্যামিতিক কারুকাজ আর ওলটানো 'ভি' অক্ষরের মতো ছাদ এক মনোরম মধ্যযুগীয় পরিবেশ তৈরি করে। রাস্তা দিয়ে অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হতেই পারে শহরটা যেন গ্রিম ভাইদের লেখা জার্মান রূপকথার বইয়ের পাতায় আঁকা কোনও ছবি থেকে সোজাসুজি উঠে এসেছে।

শহরে ঢোকার মুখেই নেকার নদীর ওপর আছে 'এবেরহার্ড ব্রিজ'। নেকার নদী এই জায়গায় দুটো ধারায় ভাগ হয়ে গিয়ে তৈরি করেছে নেকার আইল্যান্ড। রঙিন ফুলে সুসজ্জিত 'এবেরহার্ড ব্রিজ'-এর লাগোয়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা যায় নেকার আইল্যান্ডে। দ্বীপের মাঝ-বরাবর রয়েছে 'প্লাটানেনালি' - সারিবদ্ধ এবং সুউচ্চ তরুবীথির মধ্যে দিয়ে দ্বীপের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি প্রসারিত পদচারণার জায়গা। একই ধরণের গাছগুলোর বেশ কয়েকটার বয়েস দুশো বছরেরও বেশি।

দ্বীপের একদিকে নদীতে বাঁধা আছে বেশকিছু কাঠের লগিতে ঠেলা নৌকো। নদীর অপর প্রান্তে তিন-চারশো বছরের পুরোনো সারিবদ্ধ কাঠের বাড়িগুলো, নৌকায় চড়ে যেগুলোর পাশ দিয়ে নেকার নদীতে জলবিহার টিউবিংগেন ঘুরতে আসা পর্যটকদের অন্যতম প্রধান বিনোদন। ব্রিজের এক প্রান্তে একটা লাল রঙের বাড়ি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য, বাড়ির গায়ে প্রচুর দেওয়াল-চিত্র এবং স্লোগান দেখে বোঝা যাচ্ছিল সেটার সম্ভাব্য চরিত্র। দেওয়ালে এক জায়গায় বেশ বড় করে লেখা ছিল 'Kein Mensch Ist Illegal', অর্থাৎ কেউই বেআইনি নয়। তখন খোঁজ নেওয়া হয়নি, পরে জেনেছিলাম বাড়িটার নাম ছিল 'এপেলহাউস' (Epplehaus), বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র-যুবদের সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র সেটা।

টিউবিংগেনের 'আলস্টাট' অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে করতে ঘড়িতে বিকেল সাড়ে-চারটে বেজে গেলেও যেহেতু গরমকালে এখানে রাত নটা অবধি ঝকঝকে দিনের আলো থাকে, কাজেই ফেরার পথ ধরার আগে ঘুরে দেখে নেওয়া যাবে

টিউবিংগেনের উত্তরে শ্যনবাখ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত একটা ছোট্ট গ্রাম বেবেনহাউসেন (Bebenhausen), সেখানেই রয়েছে প্রায় একহাজার বছর আগে নির্মিত এই 'অ্যাবে' বা মঠ। দুইপাশে সামান্য উঁচুনিচু পাহাড়ি বনভূমির মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রায় মিনিট দশেক বাসযাত্রার পর বেবেনহাউসেন গ্রামের যে বাসস্টপে নামতে হল, তার চতুর্দিক জনমানবশূন্য। বাসস্টপের পাশ দিয়ে কিছুটা হেঁটে গেলে অ্যাবের মূল প্রবেশপথ। দেখে মনে হল প্রবেশপথের সামনের চত্বরে দিনের বেলা বাজার বসেছিল, যার পোশাকি নাম 'ফার্মার্স মার্কেট'। ভর সন্ধ্যেবেলা আমরা যখন সেখানে পৌঁছেছি তখন ভাঙা হাটে প্রায় সব ক্রেতা-বিক্রেতাই ঘরের পানে রওয়ানা দিয়েছেন, কেবল একজন মাত্র দোকানি তার অবিক্রীত সওদা গাড়িতে তুলছিলেন। ইতিহাস বলছে, ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত মধ্যযুগীয় এই বেবেনহাউসেন অ্যাবেকে ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ জার্মানির অন্যতম সমৃদ্ধশালী ধর্মীয় আশ্রম হিসাবে গণ্য করা হত। ষোড়শ শতকে উরটেমবার্গ কাউন্টির শাসকেরা এই মঠের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সেখানে একটা আবাসিক বিদ্যালয় এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বনাঞ্চলের সন্নিকটে হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে উরটেমবার্গের প্রথম রাজা মঠের একটা অংশ অধিগ্রহণ করে সেখান নিজের জন্যে একটা প্রাসাদ তৈরি করেন, শিকারের সময় রাজপুরুষদের থাকার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হত সেটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উরটেমবার্গ রাজত্বের অবসান হলে সিংহাসনচ্যুত রাজা-রানি এই মঠেই কাটিয়েছিলেন বাকি জীবনটা।

দিনের শেষে বেবেনহাউসেন অ্যাবের দর্শক বলতে তখন আমরাই কয়েকজন। বর্তমানে এই মঠ এবং সংলগ্ন গির্জার অভ্যন্তরে সেই মধ্যযুগীয় আবহের প্রায় অবিকল একটা প্রতিরূপ সাজিয়ে রাখা আছে। ঘুরে দেখা হল গির্জা, যাজকদের থাকার জায়গা, তাদের ভোজনকক্ষ, গথিকশৈলীর খিলান-যুক্ত প্রশস্ত অলিন্দ। নির্জন মঠের নিঃশব্দ অভ্যন্তরে সভাকক্ষের প্রাচীন আসবাব আর আলো-আঁধারি পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিল সাদা জোব্বা পরিহিত যাজকেরা বুঝি লাতিন ভাষায় ধর্মালোচনা করতে করতে সদ্যই সেখান থেকে উঠে চলে গিয়েছেন।

বেবেনহাউসেন দেখা শেষ করে ঘরে ফেরার পথে হেরেনবার্গ স্টেশনে এসে দেখা গেল বোবলিংগেন যাওয়ার ট্রেন পেতে তখন হাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় আছে। সেই সময়টুকুও সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে চট করে একটা চক্কর লাগিয়ে আসা হল হেরেনবার্গ শহরের পুরোনো এলাকাটায়। স্টেশন থেকে বেশি দূরেও ছিল না জায়গাটা, তাই হেঁটেই পৌঁছানো গিয়েছিল সেখানে। ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত গির্জা, টাউন হল আর বেশ কয়েকটা চোখ-জুড়ানো 'হাফ-টিমবার হাউস' নিয়ে হেরেনবার্গের 'আলস্টাট' অঞ্চলটাও টিউবিংগেনের মতোই তার প্রাচীন চেহারা প্রায় অবিকৃত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বেড়ানো শুরুর প্রথম দিনটাতেই টিউবিংগেন, বেবেনহাউসেন আর হেরেনবার্গের মতো অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ জায়গাগুলোতে একটা গোটা দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা সেবারের ইউরোপ সফরের মূল সুরটা বেঁধে দিয়েছিল গোড়াতেই। সেই গ্রীষ্মে পরবর্তী তিন সপ্তাহে ইউরোপের তিনটে বড়ো শহর এবং জার্মানির আরও কয়েকটা অল্প-পরিচিত জায়গা ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রত্যেক জায়গাতেই রীতিমত বিস্মিত হয়ে দেখেছি যে প্রাচীন ঐতিহ্যের রূপটিকে যথাসম্ভব অবিকল রেখে প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকচিহ্নগুলোকে আধুনিক পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার কাজে ইউরোপের দেশগুলোর প্রশাসন এবং সেখানকার মানুষ কতটা যত্নবান। দক্ষিণ জার্মানির তুলনামূলকভাবে অখ্যাত অথচ চিত্তাকর্ষক এই তিনটে পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে দেখার মধ্যে দিয়েই সেই মুগ্ধতার মুখবন্ধটা লেখা হয়েছিল।

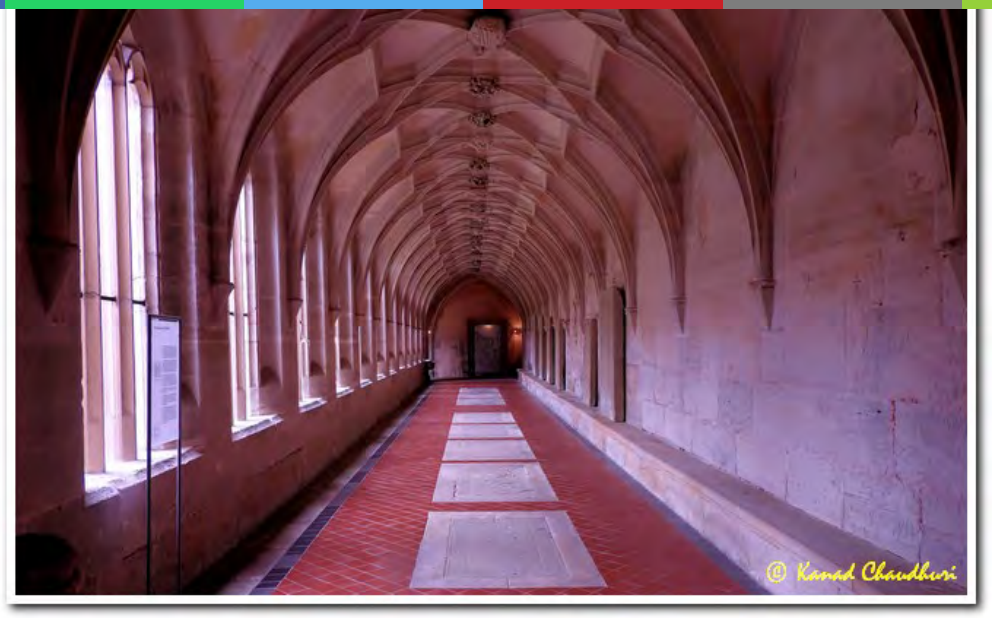

শৈশব থেকে এখনও পর্যন্ত বসবাস কলকাতায়। আইআইটি, খড়গপুর থেকে এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েশন এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন। কর্মজীবন কেটেছে ভারতের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থায়। বর্তমানে সম্পূর্ণ অবসরপ্রাপ্ত, সময় কাটে বেহালা বাজিয়ে আর নানান ধরণের গান-বাজনা শুনে। তাছাড়া একটু-আধটু বই পড়া, টুকটাক লেখালেখি, এদিক-ওদিক বেড়ানো আর সুযোগ পেলে পাখির ছবি তোলা এগুলোও আছে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়া – সাতান্ন বছর পরে আবার

তপন পাল

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

সায়গন! সায়গন!!

সায়গন প্রত্যাগত হওয়ার সুবাদে এজি বেঙ্গল অফিসে আমার বাবার নাম সুনীলকুমার বদলে হয়ে যায় সায়গন পাল। সর্বস্তরের কর্মচারীরা তাকে ওই নামেই চিনতেন, ঘনিষ্ঠরা বলতেন ভিয়েতকং পাল। ভিয়েতনাম নিয়ে তখন ভেতো স্ফীতোদর বাঙালির আদিখ্যেতা তুঙ্গে, আমাদের বিদ্যালয়েরই পদার্থবিদ্যার এক শিক্ষককে আমার পিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভিয়েতনামটা কোথায়? জবাব পেয়েছিলেন আফ্রিকায়; বলিভিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তারপরেই ভিয়েতনাম। শিক্ষকটিকে দোষ দেওয়া যায় না। তখন স্মার্টফোন ছিল না, ছিল না গুগল ম্যাপস। ইংরিজি না জানা বিপ্লববিলাসী বাঙালির বিপ্লবস্পৃহা মেটানোর জন্য সৌরীন সেন, বেদুইন, কলহন ইত্যাদি লেখকরা তখন বলিভিয়া অ্যাঙ্গোলা ভিয়েতনাম প্যালেস্টাইন ইত্যাদি নামে কল্পবিপ্লবের মোটা মোটা বই লিখতেন। পাড়ার গ্রন্থাগারে সেই বইয়ের চাহিদা ছিল বিপুল। ১৯৬৮-র নভেম্বরের শেষাশেষি, নকশালবাড়ির বছরখানেক পরে, বিশ্বব্যাঙ্কের সদ্যদায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান (১৯৬৮-১৯৮১) রবার্ট স্ট্রেঞ্জ ম্যাকনামারা [Robert Strange McNamara] (১৯১৬ – ২০০৯) কলকাতায় আসেন। তাঁর কলকাতা দর্শনকালে 'বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের দায়ে দেশকে বিকিয়ে যেতে দিচ্ছি না দেব না' বলে ইস্কুলে আমাদের চেঁচাতে বলা হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ম্যাকনামারা সাহেব ছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব (১৯৬১ – ১৯৬৮)। তাইতেই তাঁর আগমনে গাঙ্গেয়ভূমির সাম্যবাদীদের গায়ে জ্বালা ধরেছিল,তুমুল বিক্ষোভ হয়েছিল, বিমানবন্দর থেকে ধর্মতলা সাহেবকে হেলিকপ্টারে উড়িয়ে আনতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে কিছু বালক সেই হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ে সশরীরে ভিয়েতনাম যুদ্ধে সামিল হওয়ার আনন্দে সে রাত্রে চাট্টি ভাত বেশি খেয়েছিল।
মনে পড়ল এই রানওয়েতেই জ্ঞানত প্রথমবার বাবার সঙ্গে দেখা। বস্তুত এবারের ভ্রমণ এক অর্থে বাবার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যজ্ঞাপন। বিগত বছর চল্লিশ ধরে ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া যাওয়ার স্বপ্ন লালন করেছি; মধ্যবিত্ত প্রেক্ষাপটে তা কোনদিন সম্ভব হবে ভাবিনি। এর মধ্যে ইতিহাস বদলে গেছে অনেকখানি। ১৯৭৫-এ দেশ এক হলেও সূক্ষ্ম ভেদরেখা থেকেই গেছে। উত্তর গ্রামীণ, কৃষিভিত্তিক, গরিব, বছরে ছটা আটটা টাইফুন নিয়ে ঘর করা মানুষজন; দক্ষিণ উর্বর মাটির দেশ, সমৃদ্ধ কসমোপলিটান – ফরাসি ও মার্কিন ছত্রছায়ায় লালিত, সেই সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত। তাই আমাদের পূর্ব-পশ্চিমের মত এদের উত্তর দক্ষিণও যেন বাঙাল ঘটি – মুখের ভাষা থেকে হাবভাব ব্যবহারেই বুঝে ফেলা যায় কে দক্ষিণের মূলবাসী আর কে কাজের খোঁজে উত্তর থেকে আগত।

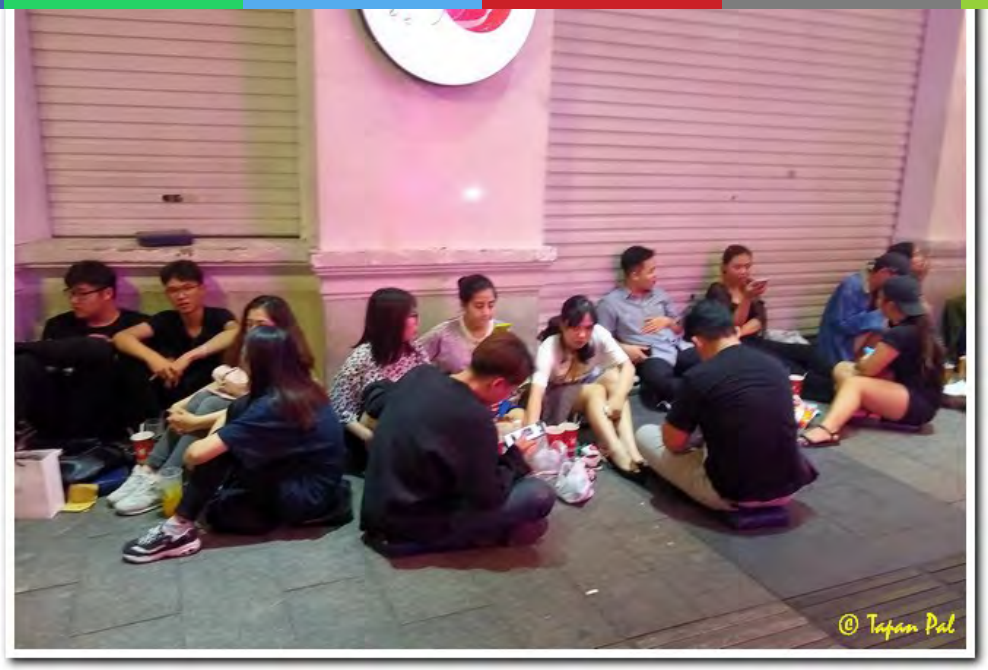

পুরো ভিয়েতনামেই (এবং কাম্বোডিয়াতেও) দোকানপাট বাজারহাট সর্বত্র মহিলাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। সাতান্ন বছর আগেও ঠিক এমনটিই ছিল। সত্যজিৎ রায় যখন রক্ষণশীল পরিবারের গৃহবধূর গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে চাকরিগ্রহণের সামাজিক চিত্রণে ব্যস্ত, তখন ভিয়েতনামে রিকশা থেকে নৌকা সবই চালাতেন মহিলারা। তখন শুনতাম দেশের ছেলেরা সব ভিয়েতকং হয়ে যুদ্ধে গেছে, মহিলারা অর্থনীতি সামলাচ্ছে। যুদ্ধ মিটে গেছে, রেওয়াজ রয়ে গেছে; বিমানবন্দরের পুরুষ শৌচালয়েও মহিলা সাফাইকর্মী। জীবনজীবিকার সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্যের জন্যই আমাদের সংস্কৃতিতে যে কাজগুলি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট, যথা স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদানকারী সেবিকা বা বিমানসখি, সেগুলিতে পুরুষকর্মীদের দেখা যায়।
১৯৭৫-এ যুদ্ধ শেষ হয়ে দুই ভিয়েতনাম যখন এক হয়, ভিয়েতনামি অর্থনীতি ছিল পৃথিবীর গরিবতম অর্থনীতিগুলির অন্যতম। আশির দশকের মাঝামাঝি অবধি মাথাপিছু জিডিপি দুশো থেকে তিনশো মার্কিন ডলারের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। ১৯৮৬-তে সরকার "Đổi Mới" শীর্ষক একগুচ্ছ আর্থিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এখন ভিয়েতনামি অর্থনীতি সমাজতন্ত্র অভিমুখিন বাজার অর্থনীতি। তবে রাজনৈতিক দল একটিই; কমিউনিস্ট পার্টি এবং যে কোনও কমিউনিস্ট পার্টির মতোই দুর্নীতি নিয়ে বিব্রত। ভিয়েতনামে পর্যটকদের মধ্যে চালু একটি বদ রসিকতা হচ্ছে 'ভিয়েতনামে যা ইচ্ছা করতে পারো, শুধু রাজনৈতিক দল খুলতে যেও না।'

অপরাহ্নে সায়গন স্কোয়ারে, কেনাকাটা বিশেষ কিছু হল না কারণ সব বস্তুই অতীব মহার্ঘ। বসে বসে বিস্তর আখের রস NƯỚC MÍA ও Lychee Iced Tea খেলাম। স্থানীয় লোকজন সবাই দেখলাম সায়গনই বলছে, কেউই হো চি মিন সিটি বলছে না। দোকানপত্তরের সাইনবোর্ডেও কোথাও হো চি মিন সিটি লেখা নেই, বড়জোর দায়সারাভাবে HCMC লেখা। HCMC মানে কী জিজ্ঞাসা করায় এক বিক্রেতা বললেন হো চি মিন সিটি; তারপর স্থানীয় ভাষায় অক্ষরচতুষ্টয়ের একটি

জানুয়ারি ১৯০১ – ২ নভেম্বর ১৯৬৩)-এর রাজত্বকালে দক্ষিণের লোক উত্তরের লোকের চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল – সমাজজীবন ছিল মুক্তমনা। হো চি মিন-এর প্রভুত্ববাদী এক ভিয়েতনামের স্বপ্ন তাদের যাবতীয় দুর্দশার মূল। এ যেন মধ্যযুগীয় কোন ছ্যাঁচড়া রাজার রক্তের মূল্যে সাম্রাজ্যবিস্তারের ব্যাকুলতা।

নবম দিনে আমরা টিকিট কেটে দেখতে গেলাম Củ Chi Tunnels; ভিয়েতনাম যুদ্ধের এক বিশিষ্ট স্মারক, আমাদের ইস্কুলজীবনে শিক্ষকদের মুখে এর গল্প শুনেছি। রাস্তায় অনেকক্ষণ সায়গন নদী (Sông Sài Gòn) আমাদের পাশাপাশি চলল। দক্ষিণ-পূর্ব কাম্বোদিয়ার Phum Daung থেকে নির্গত এই নদী সায়গন শহরের জীবনপ্রবাহ; সায়গন বন্দরের প্রাণভোমরা। মনে পড়ল, ছোটবেলায় রোজ সন্ধ্যায় বাবা মার হাত ধরে এখানে বেড়াতে আসতাম। একটুকরো বাঁশ, তার উপরিভাগ পাঁচভাগে বিভক্ত, প্রতিটি ডগায় এক টুকরো করে আখ গাঁথা – খেতে খুব ভালোবাসতাম। বাবা-মা খেতেন বাদামসিদ্ধ। নদীর ওপরে একটি আহারশালা ছিল, সেখানে গান হত – আমরা মধ্যে মধ্যে সেখানে খেতে যেতাম। এই সায়গন নদীতেই মার্কিন রণতরী দেখেছিলাম, বাবার কূটনৈতিক পরিচয়পত্রের সুবাদে তাতে উঠেওছিলাম।

Củ Chi Tunnels-এ গিয়ে দেখা গেল এখন এটি নেহাতই এক পর্যটন কেন্দ্র। বিস্তর টানেলের এক বিস্তৃত উর্ণনাভ চু চি, সাকুল্যে একশো একুশ কিলোমিটার। তদানীন্তন উত্তর ভিয়েতনাম থেকে লাওস ও কাম্বোডিয়ার মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামে রসদ পাঠিয়ে ভিয়েতকংদের সাহায্য করে প্রতিবেশী দেশে গণ্ডগোল পাকানোর পাকিস্তানসুলভ অপচেষ্টা, হো চি মিন-এর সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্নের দোসর এই টানেল। পাশাপাশি আত্মগোপনের জায়গা, যুদ্ধপ্রস্তুতির কেন্দ্র। ১৯৬৮-তে ভিয়েতকংদের Tết Offensive-এর ঘাঁটি ছিল এই টানেল। পুরোটাই জঙ্গলাকীর্ণ, গেরিলা যুদ্ধের নানাবিধ উপকরণ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পয়সার বিনিময়ে গোলাগুলি ছোঁড়ারও বন্দোবস্ত রয়েছে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকখানি হাঁটতে হয়। একজায়গায় দেখি আমেরিকান বি-৫২ বিমান থেকে ফেলা বোমায় সৃষ্ট এক মস্ত গর্ত, তার মধ্যে এক অতিকায় সাহেব দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে বসে বিয়র খাচ্ছে। সামনে একটি বোর্ড - I lost my Dad somewhere here; did You? দেখে আমার যে কি আনন্দ হল বলার নয়, সাহেবের সঙ্গে যোগ দিতেই সাহেব দৌড়ে আমার জন্যও বিয়র কিনে আনল, BIA Saigon Special, সরকারি উদ্যোগে টানেলের ভিতরেই প্রাপ্তব্য। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে মৃত বাবার জন্যে তার কী কান্না রে ভাই সে কী বলব! আমার ধারণা ছিল শুধু ভারতীয় পুরুষরাই কাঁদে, এ দেখলাম আমাদের ছাড়িয়ে যায়। আমার বাবা দেখলে খুশি হতেন, বাবার সারাজীবনের আক্ষেপ ছিল আমার তো মেয়ে নেই, আমি মরলে কেউ কাঁদবেও না।

সাহেব কেঁদে আকুল, এদিকে আমার হাসি পাচ্ছে, পেটের মধ্যে ভুসভুসিয়ে উঠছে হাসি। গতবছর এই সময়েই গনগনির মাঠে পিকনিকে গিয়েছিলাম। জলতেষ্টা পেয়েছিল বলে সবে জলের বোতলের ছিপিটা খুলেছি, কিছু ইস্কুলমাষ্টারমার্কা অকালপক্ক যুবক এসে বলল, দাদা, এটা স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। এমনকিছু করবেন না যাতে রাণী শিরোমণির অসম্মান হয়। আর এরা! আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের ধ্বংসাবশেষ আমেরিকানদেরই দেখিয়ে সেন্টুতে সুড়সুড়ি দিয়ে বেশি দামে বিয়র বিক্রি করে দুটো পয়সা কামিয়ে নিল। ধন্য ব্যবসাবুদ্ধি!

পরদিন মেকং বদ্বীপ ভ্রমণ; তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অবলোকন ও গ্রামীণ আতিথেয়তার হাতছানি। ভিয়েতনামের দক্ষিণ পশ্চিমের এই অংশটুকু অনেকটাই আমাদের সুন্দরবনের মত, মেকং বদ্বীপ সমুদ্রতলের সমতায় নদী জলাভূমি দ্বীপ ও ধানক্ষেতের এক বিস্তীর্ণ বায়োস্ফিয়ার - আয়তন ৪০, ৫৭৭ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ২.১৫ কোটি (২০১৯)। ভিয়েতনামের 'রাইস বোওল' বলে খ্যাত এই অঞ্চলে জীবন চলে মেকং-এর ছন্দে, শিরা উপশিরা ধমনীপ্রবাহের মত বিস্তৃত জলজালিকায় ভাসে বাড়ি নৌকা, বাজার, জীবন।

জীবন এখানে শ্লথ, মহিষ নদী পেরোয় নিজের খেয়ালে, নারকোলভর্তি নৌকা পাড়ি দেয় এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে, ম্যানগ্রোভের অরণ্য শিকড় হাওয়ায় ভাসিয়ে শ্বাস নেয়। ভিয়েতনামের ধান ও মাছের মোট উৎপাদনের অর্ধেক আসে এই অঞ্চল থেকে। স্বাভাবিকভাবেই একদিনের আট ঘণ্টার ভ্রমণে কতটুকু আর দেখা হয়, তবু ধারণাটি করা যায়; কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া যায় তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে। আমাদের হিমালয় থেকেই বিশ্বের দ্বাদশ ও এশিয়ার সপ্তম দীর্ঘতম নদী মেকং এর উৎপত্তি, দৈর্ঘ্য ৪,৩৫০ কিলোমিটার, জল নিষ্কাশন এলাকা ৭,৯৫,০০০ বর্গকিমি। তিব্বতীয় মালভূমি থেকে চিনের ইউনান প্রদেশ হয়ে, মিয়ানমার, লাওস, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়ার মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামে এসে দক্ষিণ চিন সাগরে তার পরিসমাপ্তি।

সায়গন থেকে বাসে Mỹ Tho। পথে, Mỹ Phong শহরের Mỹ Hóa অঞ্চলে, Bảo Định খালের ধারে, দু হেক্তার জমির উপর বিস্তৃত Vĩ nh Tràng Chùa (Vĩ nh Tràng Temple) একটি অতিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির। তাকে ঘিরে সুসজ্জিত উদ্যান। স্থাপনাকাল থেকে যে সব মহারাজরা এই মন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন তাদের সমাধি বাগানের এখানে ওখানে। স্থানীয় জমিমালিক Bùi Công Đạt-এর বদান্যতায় ১৮৫০ সালে এই বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। তারপর ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ ফরাসি সেনাবাহিনীর সঙ্গে Emperor Tự Đức-এর যুদ্ধে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকে ক্রমশ এর কথা ভুলে যায়। ১৮৯০-এ পুনঃ সংস্কার, ১৯০৪ এর ঘূর্ণিঝড়ে ধূলিসাৎ,এবং ১৯০৭ এ পুনর্নির্মাণ – এভাবেই রূপকথার ফিনিক্স পাখির মত এই মন্দিরের জেগে ওঠা। এর স্থাপত্যে প্রাচ্যের সাবেকি চৈনিক, ভিয়েতনামি ও কিমায়ের ধাঁচের সঙ্গে পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ ধাঁচের রোমান খিলানের অভূতপূর্ব সহাবস্থান। পুরো মন্দিরটিতে পাঁচটি ভবন, ১৭৮টি স্তম্ভ; সঙ্গে অতিকায় তিনটি বুদ্ধমূর্তি। দণ্ডায়মান অমিতাভ বুদ্ধ আনন্দঘন করুণার প্রতীক, হাস্যরত বুদ্ধ সুখ সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক,আর শায়িত গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ – জরা ব্যাধি মৃত্যুর জগত থেকে নিষ্কৃতির প্রতীক। এছাড়াও ষাটটি তামা ও কাঠের মূর্তি, ১৯০৭ সালে একই কাঁঠাল গাছের কাঠে তৈরি অষ্টাদশ অর্হৎ (নির্বাণপ্রাপ্ত বা নির্বাণের অধিকারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী)-এর মূর্তি, ১৮৫৪-এ নির্মিত ব্রোঞ্জের একটি অতিকায় ঘণ্টা। ১৯৮৪ সালে ভিয়েতনাম সরকার এই মন্দিরকে জাতীয় স্মারকের মর্যাদা দেন। মন্দিরের সঙ্গেই আছে একটি অনাথ আশ্রম। মেকং ডেলটাগামী বিদেশি পর্যটকদের কাছে এই মন্দির অবশ্যদ্রষ্টব্য। মন্দিরে ঢোকার তিনটি প্রবেশপথ। আশ্চর্যজনকভাবে মূল প্রবেশতোরণ সর্বদাই রুদ্ধ। পাশের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলে চোখে পড়বে ভাঙা রঙিন কাচের টুকরো সাজিয়ে পোর্সেলিন মোজেইক – তাতে বুদ্ধের জীবনকাহিনি বিবৃত।

ভিয়েতনামের যে কটি বৌদ্ধমন্দির দেখলাম, হ্যানয়ের টেম্পল অফ দ্য জেড মাউন্টেন (Đền Ngọc Sơn) বৌদ্ধমন্দিরসহ, সর্বত্রই বুদ্ধের দেশের লোক বলে বাড়তি সমাদর পেলাম। এখানে এক মহারাজ আমি বেশ কয়েকবার সারনাথ গিয়েছি

বিদেশি ভ্রমণার্থীরা আসেন বলে বাজার বসে গেছে; মূলত ভিয়েতনামি হস্তশিল্পের। রেশম, চিনামাটির চিত্রিত জিনিষপত্র, হাতে তৈরি কাগজ, Lacquerware, Calligraphic Clothes, পুতুল, ভিয়েতনামি মেয়েদের শঙ্কু আকৃতির টুপি, কাঠের ত্রিমাত্রিক জিগ-স পাজল। আমাদের বাড়িতে দুই বোন থাকেন, তাদের বয়সের ব্যবধান সামান্যই। সেই দুই বোন – আমার মাতাঠাকুরানী ও আমার পৌত্রী – আমাকে পইপই করে বলে দিয়েছিলেন তাদের জন্য শঙ্কু আকৃতির টুপি আনতে। প্রথমা স্মৃতিচারণে, দ্বিতীয়া তাঁর মুখে গল্প শুনে শুনে। বেয়াড়া আকৃতির এবং নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় এতদিন কেনা হয়নি; এখানে কেনা হল। যখন ফিরছি, মহারাজ বললেন, তোমার কার্ড দাও তো একটা। কলকাতা পৌঁছে তোমাকে ফোন করব। 'উই উইল ভিসিত সারনাথ এন্দ বোধগয়া তুগেথার' !

Mỹ Tho থেকে সাম্পান নৌকায়, ভাসমান এক বাজার ছুঁয়ে, এক দ্বীপে। দ্বীপের জেটিতেই সংবর্ধনা, দুজন ভিয়েতনামি পুরুষ গিটার ও বেহালা জাতীয় একটি স্থানীয় যন্ত্র বাজালেন, চারজন নানা বয়সের মহিলা, দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা একই পরিবারের, ভিয়েতনামি গান গাইলেন তিনটে। তারপর সেই সব গান কেউ শুনছে না দেখে চারজনে একসঙ্গে 'If you're happy and you know it/Clap your hands/ If you're happy and you know it/ Clap your hands/If you're happy and you know it/Then your face will surely show it/ If you're happy and you know it/ Clap your hands' গাইতে লাগলেন।

অতঃপর আপ্যায়ন। বাম্বু টি (আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দশদিনে যে কতরকমের চা খেয়েছি তা আপনাদের বলে বোঝান যাবে না। জেসমিন টি, লোটাস টি, সিত্রাস টি, হনি টি, বাম্বু টি, এগ টি, লিচি টি, জিনসেং টি, ম্যাঙ্গো টি...), সঙ্গে মাছভাজা, মাছটি আমাদের তেলাপিয়া গোত্রের, কুমড়োর মত কোন সবজির গায়ে চালবাটা মাখিয়ে ভাজা, প্রচুর ফল, নারকোলের জলে জারিত মিষ্টি আদা,এবং মধু। আমরা যখন খাচ্ছি তখন মেয়েগুলি এসে প্রতি টেবিলে একটি করে সুদৃশ্য বাঁশের ছোট ঝুড়ি রেখে গেল। তাইতে টগর ফুল,তুলোর (পরে জেনেছি বাঁশের ফুল থেকে আহরিত তন্তুর) ছোট্ট একটি করে পুতুল, আর একটি কার্ড -Please Tip. We live for You Tourists. Minimum USD 2 per person!

এবার ঘোড়ার গাড়ি; প্রতি গাড়িতে আরোহী দুজন। গাড়ি ছুটে চলল গ্রামীণ পাকা রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দুধারে ফুল ফুটে আছে অনর্গল; অতিকায় জবা, টগর, কামিনী, অপরাজিতা (বড় সাদা প্রজাতিটি; মহাশ্বেতা), আকন্দ, কাঠচাঁপা, গন্ধরাজ - পুকুরে পদ্ম ও শালুক। কেউ তোলে না। আমার বাড়ির তুলসীপাতা গাঁদালপাতা নিমপাতা বেলপাতা ধর্মপ্রাণ চোর প্রাতর্ভ্রমণকারীর দল ঝেড়ে ফাঁক করে দিল। পাশাপাশি ফলের গাছ; আম, আমলকী, বাতাবিলেবু, জাম, জামরুল, আঁশফল, আতা, কলা, কাঁঠাল, লিচু, কুল, চালতা। গিয়ে জেটিতে, সেখানে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক - তালজাতীয় ছোট ম্যানগ্রোভ গাছের তালশাঁসের রস।

এইবারে ক্যানোবিহার। তিন দশক আগে মুর্শিদাবাদে চাকরি করার সময় তালগাছের ডিঙিতে অনেক চেপেছি। তিনিই যে এখানে এসে নাম বদলে ক্যানো হয়েছেন তা আমি জানবো কী করে! দুজন মহিলা মাঝি, আরোহী আমরা দুজন, সঙ্কীর্ণ খাঁড়িপথ, দুধারে ম্যানগ্রোভ – ঠিক যেন সুন্দরবন। Cần Giờ Biosphere Reserve পেরিয়ে খাঁড়ি এসে মিশলো প্রশস্ত নদীতে, সেখানে জেটি। মাঝিপিসিটি হাত ধরে বললেন 'তিপ ফো দলার, দিয়ে যা ভাইপো। তোর বাবা মা সব কেমন আছে বললি না তো!'

নৌকায়। Sóc Trăng দ্বীপে কাম্বোদিয়ান একদা উদ্বাস্তুদের বাস। কাম্বোদিয়া দেখে এসেছি, তাই আর গেলাম না। এবার একটি দ্বীপে নারকোল কারখানা দর্শন। নারকোল এদেশে সহজলভ্য, কাম্বোদিয়ায় আমরা রোজ অতীব মিষ্টি জলের অতিকায় ডাব DỪA TƯƠI খেয়েছি। তবে নারকোল থেকে যে কত কি হতে পারে তাই দেখেই আমরা স্তম্ভিত। কারখানা সংলগ্ন শোরুমটি অতিকায়; শ্রীমতী পাল সেখান থেকে কোকোনাট ক্যান্ডি ও নারকোলের মালার সুদৃশ্য বাটি কিনলেন।

ফের নৌকায়। মেকংযের মস্ত বিস্তৃতি; অনেক জাহাজ, নৌকা, রৌদ্রতপ্ত দিন। তালশাঁসের রস খেয়েই মাথাটা ভার করেছিল, তার ওপরে নারকোলের কারখানায় সবাইকে ছেড়ে আমাকে ওরা বিনিপয়সায় কোকোনাট ওয়াইন খাইয়ে দিলেন। একটু ঝিমুনি এসেছিল। এবারের পথ অনেকখানি, নৌকার যন্ত্রে ইংরাজি গান বাজছিল। একটা গানের সুর চেনা চেনা লাগছিল, কান পেতে শুনে বুঝলাম অতিপুরাতন ডরিস ডে (১৯২২-২০১৯) 'Que Sera Sera, Whatever will be will be'। চেনা লাগার কারণ উত্তম-অঞ্জনার 'চৌরঙ্গী' ছবিতে এই গানটি ছিল। এই প্রেক্ষাপটে এর চেয়ে জুতসই গান আর হয় না। ডরিস ডে-র অন্যান্য গানও বাজছিল। আমি বিস্মিত হলাম। এতকিছুর পরেও আমেরিকান গান! আর পাকিস্তানের শিল্পীদের আমরা হেনস্থা করি!!

পরবর্তী দ্বীপে মধ্যাহ্নভোজ। ছড়ানো অনেকখানি জায়গা জুড়ে গাছপালা, তাতে হ্যামক টাঙানো, ফোয়ারা। মস্ত এক চালার নিচে খাওয়ার বন্দোবস্ত। অতিকষ্টে একটি হ্যামকে উঠে সবে রাজ কাপুরের গান ধরেছি, য়ে রাত ভিগি ভিগি, য়ে মস্ত ফিজায়েঁ, উঠা ধীরে ধীরে, য়হ চাঁদ প্যায়ারা প্যায়ারা। ওমা! দেখি কি হোটেলের এক ভিয়েতনামি মহিলা কর্মচারী নার্গিসসুলভ আ আ আ আ আ ধরলেন। তড়িঘড়ি নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি জানলে কি করে? তিনি বললেন আমাদের এখানে অনেক ভারতীয় আসেন, আর যে ভারতীয় হ্যামকে ওঠে সেই এই গানটা গায়। শুনে আমি অপ্রস্তুত।

আস্ত মাছ ভেজে টেবিলে সাজানো,সঙ্গে অতিকায় ফুচকার মত রুটি, আঠালো ভাত। গোবিন্দভোগ চালের ফ্যান-ভাত বাটিতে দিয়ে বললো 'ইত ইস ত্রাদিশনাল ভিয়েতনামিজ রাইস পরিজ'। সঙ্গে অতিকায় গেলাসে ঈষদুষ্ণ জেসমিন টি, শ্রীমতী পাল জল চাইলেন, 'তোমরা কেমন লোক গো! লোককে খেতে দিলে জল দিতে হয় জানোনা'! অমনি একটা মেয়ে এসে সাড়ে সাতশো মিলিলিটারের এক বোতল জল হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল ত্রি দলার। আহারে পদের শেষ নেই; মাছই অনেক রকমের, স্কুইদ, অয়েস্তার, শূয়র, সাপ, ঝিনুক, ফল, সবজি, নুদলস।

ফেরার পথে একটি বাঁশের কারখানা দেখা হল। বাঁশ থেকে যে এরা কত কী যে তৈরি করে! শ্রীমতী পাল বাঁশের ফুল থেকে আহরিত তন্তুর ঝাড়ন কিনলেন রান্নাঘরের জন্য। আমি একটি গামছা কিনলাম। গামছা ভিয়েতনামি সংস্কৃতির মুখ বিশেষ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকা ভিয়েতকং গেরিলারা কাঁধে গামছা রাখতো; ওটিই ছিল তাদের পরিচিতি, পরিচয়পত্র।

এবারে সায়গনে ফেরা, নেপথ্যে তখন বেহালা বাজছে। দশদিন মহা আনন্দে কাটল, অদ্য শেষ রজনী। অপরাহ্নে যাওয়া হল সায়গন শহরের কেন্দ্রে Nguyen Hue Walking Promenade-এর শেষে পিপলস কমিটি বিল্ডিং দেখতে। কলকাতার যেমন ভিক্টোরিয়া বা হাওড়া সেতু, লন্ডনের যেমন বিগ বেন, সায়গনের তেমনি ১৮৯৮ সালে নির্মিত ফরাসি স্থাপত্যের উজ্জ্বল হলুদবরণ এই ভবন শহরের অভিজ্ঞান। সরকারি অফিস, তাই বহিরাগতের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এটি অপরাহ্নিক বিনোদন কেন্দ্র, মস্ত বাঁধানো চাতাল, পিপলস কমিটির জন্মশতবার্ষিকী (১৯৯০)তে প্রতিষ্ঠিত পুস্তক পাঠরত হো চি মিনের মূর্তি – কাছাকাছির মধ্যে শহরের আরও কিছু দর্শনীয় ভবন, সায়গন অপেরা হাউস, রেক্স হোটেল, নতরদাম ক্যাথিড্রাল, কেন্দ্রীয় ডাকঘর, ইউনিয়ন স্কয়ার শপিং মল। রেক্স হোটেলের ছাদের আহারখানাটিতে বসে সিঁদুর ছড়ানো সূর্যাস্ত না দেখলে নাকি সায়গন দেখা পূর্ণ হয় না, এমনটিই প্রবাদ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কালে রেক্স হোটেল (Khách Sạn Rex) ছিল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের আস্তানা; সেই সুত্রে কূটনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র। বাবার মুখে নাম শুনেছি,গিয়েওছি। ১৯২৭ সালে যাত্রা শুরু করা এই হোটেলের ভবনটি পাঁচতলা, সর্বমোট ২৮৬ টি ঘর।

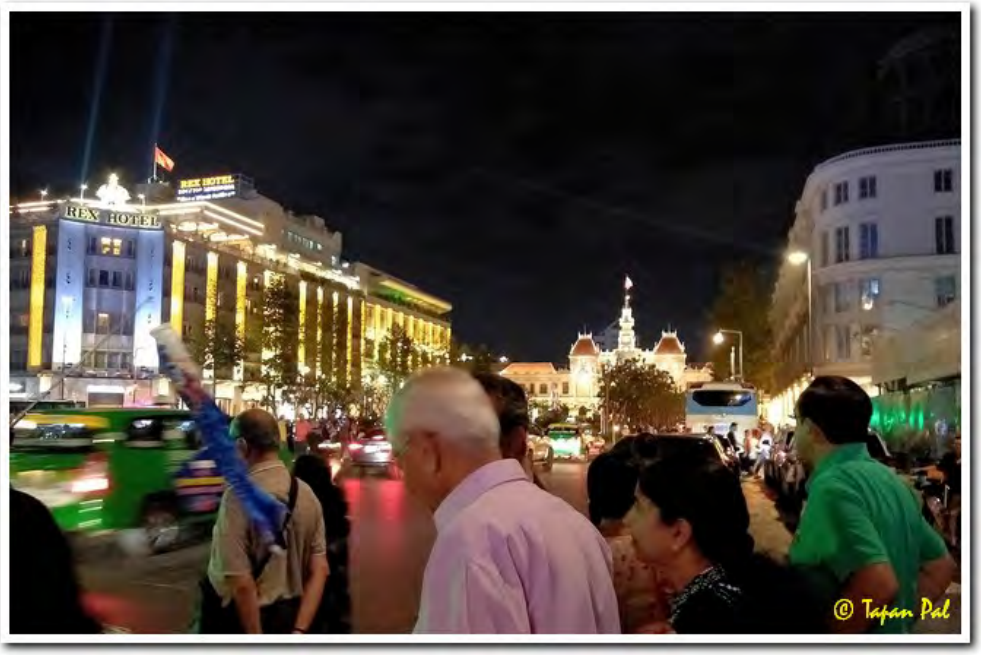

ইংরাজি নববর্ষ সদ্য গেছে, সামনেই Tết Nguyên Đán (Festival of the First Morning of the First Day),বসন্ত উৎসব,ভিয়েতনামি নববর্ষ এবং ভিয়েতনামের সর্বপ্রধান উৎসব। আমাদের দুর্গাপূজা চারদিনের,ওদের Tết কমপক্ষে তিনদিনের, বেশিরদিকে দশ বা পনেরো দিনের। আমাদের হোটেলের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কতদিন ধরে Tết করেন'। 'যতদিন না টাকা ফুরাচ্ছে, বা হোটেল কর্তৃপক্ষ চাকরি খাওয়ার ধমকি দিচ্ছে' - তার সপ্রতিভ জবাব। ওদের ক্যালেন্ডার আমাদের বাংলা পঞ্জিকার মত, সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সমন্বয় সাধনের অদম্য প্রচেষ্টা; তাই তারিখ এক থাকে না। ২০২০ সালে Tết পড়েছিল ২৫শে জানুয়ারি। গোটা চত্বর,তার আশেপাশের রাস্তাঘাট Tết উপলক্ষে আলোয় সেজেছে; আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে আলো। আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো। আমার নয়ন হতে

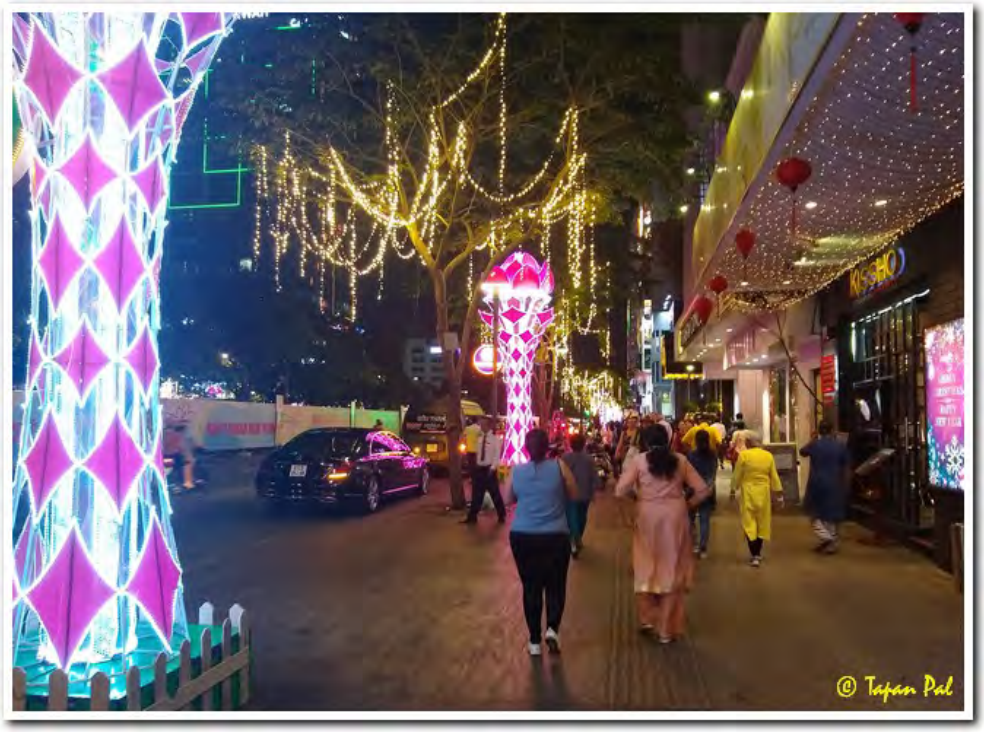

নিখিলের আনন্দধারায় স্নান করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। সারা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে গায়ে গা লাগছে। লোকে ফুটপাথে বসে কফি সিগারেট আর ভিয়েতনামের জাতীয় পদ ফো (Phở; ভিয়েতনামি নুডল সুপ) খাচ্ছে, বিয়ার খাচ্ছে, সাবান জলের বুদবুদ ওড়াচ্ছে, বিদেশি পর্যটকরা ছবি আঁকছেন, বিক্রি করছেন, দাম লেখা এনি প্রাইস। বোঝা গেল তরুণ প্রজন্মের বাজেট পর্যটকরা এভাবেই বিদেশে কিঞ্চিৎ আয়ের প্রচেষ্টা করে থাকেন।

ভিয়েতনাম দেশটি, ১৯৭৫ সালের সংযুক্তির পর,বেশ বড়সড়। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃতি ১৬৫০ কিলোমিটার,পূর্ব পশ্চিমে মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে একশো কিলোমিটার। উত্তর দক্ষিণ ১৬৫০ কিলোমিটার বিস্তৃতির পুরোটাতেই পূর্বে সমুদ্র। দেশটিতে দেখার জিনিসের শেষ নেই, বিশেষত যাঁদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে আগ্রহ, তাঁদের। আর পর্যটনকে এঁরা এত সুন্দর প্যাকেজিং-এ উপস্থাপিত করে, যে বাঁকুড়ার একটি গ্রামীণ রাস্তাকেও এরা আন্তর্জাতিক ভ্রমণগন্তব্য বানিয়ে দিতে পারে। একদম উত্তরের লো নদীর তীরে Ha Giang শহরে সময় নাকি থেমে আছে। একদম দক্ষিণের ক্যানন থো আর হাউ নদীর মিলনস্থলে Can Tho ভাসমান বাজার। আর এই দুইয়ের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে অগণন ভ্রমণ গন্তব্য - উত্তরের ব্যাং জিয়াং নদীর তীরে শান্ত শহর Cao Bang, হ্যানয় শহর, চুনাপাথরের পর্বত Ninh Binh, শিল্প শহর Haiphong, সমুদ্রতীরের শহর Dong Hoi, ঐতিহাসিক শহর Hue, প্রাচ্যের ভেনিস Hoi An, গ্রামীণ ভিয়েতনামের গন্ধমাখা Kon Tum, চিরবসন্তের ফরাসি পর্যটনকেন্দ্র Dalat, দক্ষিণ চিন সাগরের পারে সৈকত শহর Nha Trang; আর দক্ষিণে সাবেকি সায়গনকে ঘিরে Mekong Delta, ফরাসি ঔপনিবেশিক শহর Vung Tau, কাম্বোডিয়ার সীমান্তে কৃষ্ণকুমারী (Black Virgin) পাহাড়ের গায়ে Tay Ninh, নদীমাতৃক My Tho। এবারে Hue ও Dalat যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, Dalat-এ সবাই ক্লাউড হান্টিং করতে যান; কিন্তু ভ্রমণসংস্থাটি খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না; বললেন তাহলে আপনার ভ্রমণসূচি কাস্টোমাইজ করতে হবে, খরচও পড়বে বিস্তর। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, মনে নেই ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় (১৯৬৮) গাঢ় শীতে মধুপুরে স্কাউট ক্যাম্পে গিয়ে টিলার মাথায় মেঘ দেখে দৌড়ে দৌড়ে উঠে গিয়ে দেখেছিলাম কোথায় কী; এ তো ঘন কুয়াশা! ধরে নাও ওই-ই তোমার ক্লাউড হান্টিং।

ভারত থেকে আমাদের সঙ্গে একজন ট্যুর ম্যানেজার গিয়েছিলেন – ছেলেটি হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাস, পর্যটনশিল্প পরিচালনায় ডিপ্লোমা না ডিগ্রি কি একটা আছে; অনেকগুলি ভাষা জানেন। তবে তার ভূমিকা ছিল সদস্যদের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা, বিশেষত সবাই যখন বয়স্ক। ভ্রমণ ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক ব্যাপার স্যাপার তারা ভাগ করে দিয়েছিলেন হ্যানয়, সিয়েম রিপ আর সায়গনের তিনটি ভ্রমণসংস্থাকে – তারাই থাকা খাওয়া ঘোরানোর সব ব্যবস্থা করেছিলেন, দেশের ইতিহাস সংস্কৃতি রাজনীতি মোটামুটি জানা আছে এমন ইংরাজি জানা গাইড দিয়েছিলেন (হ্যানয়ে হোয়ে, সিয়েম রিপে শরথ আর সায়গনে নিক)। নিক ছেলেটি হাসিখুশি, সে আমাকে সায়গনের ইতিহাস বলবে কি, ১৯৬৩ র সামরিক অভ্যুত্থানের সময় আমি সায়গনে থাকতাম শুনে সে আমার থেকেই শহরটা কেমন ছিল জানতে চায়। ফেরার আগের দিন তাকে বললাম, তোমাদের কনডাকটেড ট্যুরের চক্করে পড়ে আমার Hue ও Dalat যাওয়া হাতছাড়া হল। শুনে সে অবাক! বললো এই নাও আমাদের সংস্থার কার্ড, জানো তো ভিয়েতনামের ৩৩১,২১২ বর্গ কিলোমিটারের দেশে দশটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর - Cần Thơ, Da Nang, Hai Phong, Hanoi, Ho Chi Minh City, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh ও Vinh; তেরোটি ঘরোয়া বিমানবন্দর। তোমার যেদিন আসতে ইচ্ছে হবে, শুধু জানিয়ে দেবে কবে কোন উড়ানে তুমি কোথায় নামছো, – বাকিটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। আশায় আশায় বসে আছি ওরে আমার মন।

আমাদের ফেরার টিকিট ছিল সায়গন থেকে বিকাল চারটে চল্লিশের মালয়েশিয়ান এয়ালাইন্সের MH ৭৫৯ ধরে সাতটা পঁয়তাল্লিশে কুয়ালালামপুর; সেখান থেকে রাত নটা পঞ্চাশের মালয়েশিয়ান এয়ালাইন্সের MH ১৮০ ধরে রাত এগারোটায় চেন্নাই, সেখান থেকে পরদিন সকালের ইন্ডিগো ধরে কলকাতা। আমরা টিকিটটা বদলে করে নিয়েছিলাম সায়গন থেকে দশ তারিখে রাত দুটো চল্লিশের ইন্ডিগো ধরে সকাল চারটে চল্লিশে সরাসরি কলকাতা। উদ্দেশ্য সায়গনে একটা বাড়তি দিন পাওয়া।

ন তারিখ সকাল থেকেই হোটেল (Aristo Saigon Hotel. 3A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh City) খালি হতে শুরু করল। বেলা বারোটায় চেক আউট করে আমরাও। আমাদের ভ্রমণসংস্থা হোটেল থেকে বিমানবন্দর যাওয়ার জন্য একটি গাড়ির বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমরা তার সঙ্গে বাড়তি বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলাম রাত দশটা অবধি। ঘোরা হল শহরের সেই সব এলাকাগুলো যেখানে টুরিস্টরা সচরাচর যায় না - স্থানীয় লোকজনদের জনবসতি, পাড়া, বাজারহাট, ঝগড়াঝাঁটি। সেই সন্ধ্যায় আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম সায়গন নদী (Sông Sài Gòn)র তীরে। চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড এর মতন নদীতীর – দুটিই তো ফরাসি উপনিবেশ ছিল – যদিও এরা বলে রিভিয়েরা। সেদিন শুধু আমরা দুজন; মনে পড়লো ছোটবেলায় (১৯৬৩) রোজ সন্ধ্যায় বাবা মার হাত ধরে এখানে বেড়াতে আসতাম। এই নদীর উপরে নাকি পরীদের ওড়াউড়ি। সূর্যাস্তের পরে পুরুষ নারী ঘনিষ্ঠ হয়ে এই নদীর ধারে বসলেই মিচকে পরীরা নাকি উড়ে এসে তাদের কোলে একটি শিশু ফেলে দিয়ে যায়। ফিরে এসে মাকে গল্পটা বলতেই তিনি বললেন 'ওমা! এই গল্প তো আমিও শুনেছি। আমি তো ভয়ে ভয়ে থাকতাম; নাকচ্যাপ্টা ছেলে নিয়ে দেশে ফিরলে লোকে কি বলবে! '

শব। স্মৃতিও তেমনি উজানে বায়। সময় ধায়, স্মৃতি ধায় বিপরীতে। সাতান্ন বছর পর সেই ফেলে আসা সেই 'বাঁশের ডগায় আখ' এর জন্য আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

তবে পাওয়া গেল না। কুচো করে কাটা আখ পাওয়া যাচ্ছে, আখের রস (nước mía/ mía đá)-এর দোকান সার দিয়ে, আখের রস দিয়ে ঠাণ্ডা চা (Nước Sâm) ও পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু আমি যে জিনিসটি খুঁজছি, পাচ্ছি না। আরও অসুবিধা বস্তুটির নাম জানিনা, আর ভাষাগত সমস্যা তো আছেই। ধরলাম এক বৃদ্ধ ভিয়েতনামি ভদ্রলোককে; পোষাকে-আশাকে ফিটফাট, স্যুট-টাই পরা, হাতে ছড়ি – নদীতীরের এক বেঞ্চিতে চুপচাপ নদীর দিকে চেয়ে বসেছিলেন – দেখে মনে হল ইনি নিশ্চয়ই ইংরিজি জানবেন।

প্রৌঢ় মানুষটি বোধহয় ঠিক এটাই চাইছিলেন যে কেউ তার সঙ্গে কথা বলুক। প্রাথমিক ভূমিকার পর উনি আমাকে সিগারেট দিতে চাইলেন, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। ভিয়েতনামি সিগারেট অতি কড়া, চোদ্দ বছর বয়স থেকে সিগারেট খাচ্ছি, তাও কাশি আসে। আর আমার অভ্যাস চেঙ্গাইল বা চেন্নাই, বেলুড় বা বেলুর – যেখানেই যাই না কেন, নিজের ব্র্যান্ডের সিগারেট নিয়ে যাওয়া। তাই থেকে দিলাম একটা। খুশি হলেন।

আলাপ গড়াল। বিবরণ শুনে বললেন ওই জিনিসটাকে বলে mía ghim; গুগলে দেখ, ছবি পাবে। তবে এখন আর ওই জিনিস পাওয়া যায় না – মানুষের স্বাস্থ্য-সচেতনতা বেড়েছে, আর জিনিসটি তৈরি করাও সময় এবং শ্রম সাপেক্ষ।

তার গল্প শুনলাম। তিনি সায়গনেরই লোক, শৈশব কৈশোর এখানেই কেটেছে, আমার মতোই তিনি সায়গনে Trưng Sisters-দের মূর্তি দেখেছেন; সায়গনের রাস্তায় মার্কিন সেনা বা সাঁজোয়া গাড়ি দেখেছেন। ১৯৬৩র সামরিক অভ্যুত্থান পরবর্তী ডামাডোলের দিনগুলিতে তিনি ফরাসি দেশে গিয়েছিলেন পড়াশোনার জন্য, পঁচাত্তরের ৩০ এপ্রিল সায়গন শহরের পতনের পর দেশে ফিরতে সাহস পাননি, চলে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে। সেখানেই মেমসাহেব বিবাহ, সংসার, পুত্রকন্যা। দুবছর হল একাই নিজের দেশে ফিরেছেন; বড় ইচ্ছা নিজের দেশে সমাহিত হবেন।

সময় গড়ায়, বিদায় নেওয়ার পালা, প্রবীণ মানুষটি সুভেনির শপ থেকে কিনে আনলেন সাবেকি দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতাকা – হলুদ জমির উপর আনুভূমিক তিনটি লাল সরলরেখা, ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৫ এটাই ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতাকা - ধাতব ব্রোচ, শ্রীমতী পালের জন্য। আমাদের একটি প্রজন্ম যেমন সাতচল্লিশের দেশভাগ মানতে পারেননি, উদ্বাস্তু হয়ে বোঁচকা পুঁটলি নিয়ে হাঁটা দিয়েছিলেন অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে; ওনাদেরও একটি প্রজন্ম তেমনি পঁচাত্তরের দেশ- সংযুক্তি মানতে পারেননি, Boat People (Thuyền nhân Việt Nam) হয়ে বোঁচকা পুঁটলি নিয়ে ডিঙি নৌকায় ভেসে পড়েছিলেন দক্ষিণ চিন সাগরে। আজও সায়গনকে স্থানীয়রা সায়গনই বলে,হো চি মিন সিটি কেউ বলে না। ভদ্রলোক আমাকে দিলেন ভিয়েতনামের পাউরুটি Bánh mì, বললেন বাড়ি গিয়ে ছেলে বউমা নাতনির সঙ্গে খেও, বোলো আমি পাঠিয়েছি। আমি তাকে দিলাম ভারতীয় সিগারেট। বহতা নদীর সমুখে, নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নিচে আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন শেষ হয়ে গেছে সব; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ, পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক— কর্কট— তুলা— মীন।

বিমানবন্দরে ঢোকার মুখে কেউ টিকিট বা পরিচয়পত্র দেখতে চাইল না। ভিয়েতনামি ডং বদলে মার্কিন ডলার নিলুম,মেয়েটা ফরফর করে গুনে দিয়ে দিল,একবারও বলল না পাসপোর্ট দাও,প্যান নম্বর দাও। সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল বলে শ্রীমতী পাল শূয়র খেতে রাজি হলেন না,অথচ সারা বিমানবন্দরে শূয়র ব্যতীত কিছু নাই। ভেজ বার্জারে শুয়রের দুটো চাকতির ওপর শশা পিঁয়াজ লেটুস,চিজ বার্জারে শুয়রের দুটো চাকতির ওপর চিজ ছড়ানো। একজন বললেন বাইরের পিজা হাটে যাও; বলবে ইন্দিয়ান জৈন পিজা। বিমানবন্দরের দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে,খেয়ে,আবার দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম; কেউ গ্রাহ্যও করল না। আমার চেন্নাই বিমানবন্দরের অভিজ্ঞতা মনে পড়ছিল। নিরাপত্তায় ঢুকে দু হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালাম, রক্ষীটি বললেন দোন্ত স্তপ,কিপ ওয়াকিং। অভিবাসনে এখানেও সেনাবাহিনীর লোক,তবে উত্তরীয় স্তালিনিয় কোটের বদলে সাদা হাফ শার্ট পরা; টাইয়েরও কোন বাপ মা নেই,কেউ পরেছে কেউ পরেনি। শোল্ডার ব্যাজ দেখে বুঝে নিতে হয় এনারা সেনাবাহিনির। দুই ভিয়েতনামের চারিত্রিক বিভাজনের এক নির্ভুল অভিজ্ঞান।

আমরা বেড়াতে গেলে শ্রীমতী পাল খরচখরচার একটি হিসাব রাখেন। দুঃখজনকভাবে এইবারেই প্রথম তার ব্যত্যয় ঘটল। কারণ খরচ হয়েছে ভারতীয় রুপিতে (ভিয়েতনামের অনেক দোকানেই, বিশেষত ফুটপাথের হকাররা, ভারতীয় রুপি নেন), মার্কিন ডলারে, ভিয়েতনামি ডং-এ, কাম্বোদিয়ান রিয়েলে (কাম্বোদিয়ায় মার্কিন ডলারই চলে, তবে দোকানদাররা ফেরত দেওয়া অর্থের পরিমাণ এক মার্কিন ডলারের কম হলে কাম্বোদিয়ান রিয়েল দেন), মাল্টিকারেন্সি কার্ডে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ক্রেডিট কার্ডে। এর মধ্যে আবার ভারতীয় রুপি বদলে মার্কিন ডলার, মার্কিন ডলার বদলে ভিয়েতনামি ডং,ভিয়েতনামি ডং বদলে মার্কিন ডলার,মার্কিন ডলার বদলে ভারতীয় রুপি; তাদের পারস্পরিক বিনিময়হার – হিসাব রাখতে গেলে বেড়ানো ছেড়ে সারাদিন ওইই করতে হয়।

আমি গাই ঘরে ফেরার গান

ইন্ডিগো এল, উঠে বসলাম। উড়োজাহাজ যখন দৌড় শুরু করছে, বুকের মধ্যে এক পুকুর আবেগ যেন উঠে এল। বিদায় ভিয়েতনাম। ধন্যবাদ দেখা করার জন্য। বিগত চল্লিশ বছরে কখনও ভাবিনি দেখা হবে। আর ভালো হত যদি সেই লোকটাকে নিয়ে আসতে পারতাম। লোকটা তোমায় বড্ড ভালোবাসতো গো!

আমাদের সহযাত্রিণী এবারে এক জাপানি পিসিমা। ঈশ্বর আছেন কি না জানি না, তবে বিমানসংস্থাগুলি দেখেছি চিরকাল আমার পাশের আসনে বকমবাগীশ বক্তিয়ার খিলজি গোছের লোককেই বসান। ইনিও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুমোবে? আমি বললাম এই সিটে ঘুমনো যায় নাকি! গল্প করবো! তিনি আমাকে ফস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গল্প শুনবে'? আমি তো এক পায়ে খাড়া।

পিসি বললেন 'জানো তো! জাপান বলে না একটা দেশ আছে। তার চারিদিকে সমুদ্র; আর লোকগুলো ফর্সা ফর্সা। আজ থেকে অনেক অনেক অনেক অনেক বছর আগে সেখানে উরাশিমা তারো বলে একটা লোক ছিল। সে একদিন সমুদ্রের ধার ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, দেখে কি কটা ছেলে একটা ছোট কচ্ছপ ধরেছে, আর তার পায়ে দড়ি বেঁধে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। উরাশিমা ছেলেগুলোকে বললো অমন করছ কেন, ওকে ছেড়ে দাও। ছেলেগুলো বলল - না, আমরা ওকে

তার অনেকদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা উরাশিমা সমুদ্রের ধার ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, শুনতে পেল কে তার নাম ধরে ডাকছে। অন্ধকারে খুঁজেপেতে দেখল জলের কিনারে এক মস্ত কচ্ছপ। কচ্ছপটি বলল কি গো! আমাকে চিনতে পারলে না! সেই তুমি আমাকে কিনে জলে ছেড়ে দিয়েছিলে। উরাশিমা তো অবাক! কি বিরাট বড় হয়ে গেছে সে। সে বললো 'শোনো না! তুমি সে সেদিন যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তাতে আমাদের রাজামশাই খুব খুশি হয়েছেন। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যেতে। তুমি শিগগির আমার পিঠে উঠে বসো তো! উরাশিমা কচ্ছপের পিঠে উঠে তার গলা জড়িয়ে বসলো,আর তক্ষুনি কচ্ছপটি ভুস করে ডুব দিয়ে তাকে সমুদ্রের তলায় ড্রাগনরাজের মণিমাণিক্য ভরা সুখের রাজ্যে নিয়ে হাজির করলো। রাজামশাই উরাশিমাকে দেখে ভারি খুশি, তুমি আমার প্রজা কচ্ছপের প্রাণ বাঁচিয়েছো; তুমি আমাদের অতিথি। থাকো আমাদের সঙ্গে যতদিন ইচ্ছে। সেই কচ্ছপ ছিল ড্রাগনরাজকুমারীর সখি; তার সখির প্রাণ যিনি বাঁচিয়েছেন তিনি এসেছেন শুনে ড্রাগনরাজকুমারী উরাশিমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলেন। দুজনের ভারি বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

উরাশিমার ভারি মজা, খায় দায় গান গায়, মহাসুখে দিন যায়। শুধু মধ্যে মধ্যে নিজের ফেলে আসা গ্রামটির জন্য মন কেমন করে, কিন্তু এরা তাকে এত আদরযত্নে রেখেছে যে সঙ্কোচে সে কিছু বলতেও পারে না; এভাবে কিছুদিন কাটল। শেষে সে একদিন রাজামশাইকে বলল যে সে একবার বাড়ি যেতে চায়। রাজামশাই উৎসাহ দেখালেন না, কিন্তু উরাশিমা নাছোড়;শেষে রাজামশাই রাজি হলেন। উরাশিমা চলে যাবে শুনে রাজকুমারী সজলচোখে বিষণ্নমুখে চেয়ে রইলো তার দিকে, উরাশিমা তাকে বোঝাল, 'আমি তো মায়ের সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব। চিন্তা কী!'

রাজকুমারী রাজি হল উরাশিমাকে যেতে দিতে। বিদায়কালে রাজকুমারী উরাশিমার হাতে এক রত্নখচিত বাক্স দিয়ে বললো 'খুব সাবধানে রাখবে এই বাক্স। কিছুতেই এই বাক্স খুলো না। যদি খোলো তবে আর আমাদের দেখা হবেনা।' ইতোমধ্যে রাজকুমারীর সখি সেই কচ্ছপ এসে হাজির,সেই পিঠে চাপিয়ে উরাশিমাকে পৌঁছে দিল ঠিক সেই জায়গাটিতে যেখান থেকে সে উরাশিমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

কচ্ছপ চলে গেল, কিন্তু উরাশিমা কিছুই চিনতে পারে না। চারিদিকে মস্ত মস্ত বাড়ি,চওড়া চওড়া রাস্তা,অচেনা সব মুখ। এক বুড়োমানুষের সঙ্গে দেখা হতে সে জিজ্ঞাসা করল,এই গ্রামে উরাশিমা বলে একজন থাকে,তার বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন? বুড়োমানুষটি অবাক হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরে বলল, 'সে অনেক অনেক দিন আগের কথা,উরাশিমা তারো বলে একজন নাকি এই গ্রামে থাকত। সে সমুদ্রের নিচের ড্রাগনরাজ্যে চলে গেছিল বলে গল্প আছে। সেখানে নাকি ড্রাগনরাজকুমারীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তবে বাছা, গল্পের কি আর কোনো আগামাথা থাকে?' উরাশিমা চেঁচিয়ে বলে 'আমিই সেই উরাশিমা; সত্যিই ড্রাগন রাজকুমারীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। এই দ্যাখো তার দেওয়া উপহার'। উত্তেজনার বশে সে সেই রত্নখচিত বাক্স বার করে খুলে ফেলল।

অমনি বাক্স থেকে বেরিয়ে এল বদ্ধ সময়ের নীলচে ধোঁয়া, তিনশোটা বছরের বোঝা আছড়ে পড়ল উরাশিমার গায়ে। ধোঁয়া লাগতেই মুহূর্তে সে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে গেল। তারপর তার দেহ বালি হয়ে মিশে গেল বালুকাবেলায়। ড্রাগনরাজকুমারী এসব কিছুই জানতে পারল না। সময়বিহীন কল্পলোকে সে বসে রইল উরাশিমার প্রতীক্ষায়।

শুনে তো আমি একেবারে অভিভূত,আপ্লুত! ও মা গো কি বলে গো! এ তো আমাদের কালিদাসবাবুর বিক্রমোর্বশীয়ম্ – নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ,-অনন্তযৌবনা নন্দনবাসিনী ঊর্বশীর প্রতি মরণশীল রাজা পুরূরবার মুগ্ধ অপার আকুতি। পিসিকে আমি সংক্ষেপে ঊর্বশী-রাজা পুরূরবার প্রেমপোখ্যানটি শোনালাম। তাঁদের বিবাহে ঊর্বশীর শর্তচতুষ্টয়ের (১। ঊর্বশী যেন কখনো পুরূরবাকে নগ্ন অবস্থায় না দেখেন। ২। শুধুমাত্র ঊর্বশী চাইলেই পুরূরবা তাঁর সাথে মিলিত হতে পারবেন। ৩। ঊর্বশীর শয্যাপার্শ্বে দুটি মেষশাবক বাঁধা থাকবে এবং তাদের চুরি হওয়া থেকে রক্ষার দায়িত্ব পুরূরবার। ৪। পুরূরবা মাত্র এক সন্ধ্যা ঘি খেতে পারবেন) শুনে পিসির কী হাসি! তোমাদের দেশে মেয়েরা বিয়ের আগে এমন শর্ত দেয় নাকি! তারপরেই শ্রীমতী পালকে জিজ্ঞাসা করলেন কি গো! তোমার এমন কোনও শর্ত ছিল নাকি!

রাত বাড়ছে। আমরা উড়ে চলেছি উত্তর-পশ্চিমে, তাই দীর্ঘায়িত হচ্ছে সময়; জানালায় লটকানো মস্ত এক চাঁদ। মনে পড়ল, একদা গ্রীষ্মের রাতে ছাদে শুয়ে শুয়ে বাবা চাঁদের চরকাকাটা বুড়ির গল্প বলতেন। দশ দিনের পুরো ভ্রমণটিতে এতবার বাবার কথা মনে পড়েছে! দেশে ফেরার পরেও ভিয়েতনামের প্রতিটি খবরে বাবার উৎসাহ ছিল অসীম। ১৯৯৭ পূর্ববর্তী আন্তর্জালবিহীন সেই যুগে কাজটা সহজ ছিল না। বাবার সঙ্গেই New Empire এ Roland Joffe র The Killing Fields দেখেছি; দেখেছি The Iron Triangle; Good Morning, Vietnam; Born on the Fourth of July; নন্দনে বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলাম Operation Dumbo Drop দেখাতে, বাবার সেই শিশুর মত উচ্চকিত হাসি আজও কানে লেগে।

দমদম বিমানবন্দর। কার্ড বিনিময়। পিসি জাপানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, যাচ্ছেন বারাণসী। জাপানে আমন্ত্রণ জানালেন।

বাড়ি। অনেকদিন ছিলাম না; ফ্রিজ খালি। তাই বাজারে। বিস্তর সবজিপাতি কিনে দাম দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিতেই অপ্রস্তুত। ওমা! এ তো সব ডলার!

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূল ক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

দ্বীপের নাম সান্তোরিনি

সোমদেব পাকড়াশী

এথেন্সে যে হোটেলে আছি সেটির ব্যালকনিতে দাঁড়ালে অনতিদূরে বিশ্ববিশ্রুত এক্রোপলিস নানা রঙে রূপে দৃশ্যমান। দিনকয়েক এক্রোপলিসসহ নানা দর্শনীয় জায়গা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দে দেখা হলে সেদিন নৈশভোজের পর মনে পড়ল পরের দিন কাকভোরে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে হবে। সান্তোরিনি দ্বীপে হোটেল বুক করা আছে। ফেরিঘাঁটিতে সময়মতো পৌঁছনো চাই। তড়িঘড়ি সেকথা রিসেপশনে জানাতে ওদের একটা ফোনকলেই মুহূর্তে মুশকিল আসান হল। ট্যাক্সির ব্যবস্থা তো হলই ফেরির টিকেটদুটিও কনফার্ম করানো গেল। এছাড়া তারা সবিনয়ে জানালেন যে সকালে প্রাতরাশের পুরো ব্যবস্থা থাকবে। পরেরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই নিস্তব্ধ জনশূন্য প্রাতরাশ ঘরে পৌঁছে দেখা গেল অন্যান্য দিনের মতই সেখানে নানা ফলের রস, দই, চা, কফি, টোস্ট, চিজ, মাখন, ডিমসেদ্ধ, বেকন ইত্যাদিসহ এলাহি ব্যবস্থা করা আছে। এদের আন্তরিক আতিথেয়তায় মনটা ভরে গেল।

কাঁটায় কাঁটায় ভোর পাঁচটা। ট্যাক্সি এসে হাজির। ঘুমন্ত এথেন্সের নীরব পথ বেয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম আর ইউরোপের সবচেয়ে বড় পোতাশ্রয় পাইরিয়াস-এ ফেরিতে ওঠার অপেক্ষায় আমরা। সেখান থেকে সমুদ্দুরপথে কমবেশি ঘন্টাপাঁচেক পরেই অপরূপ দ্বীপ সান্তোরিনিতে পৌঁছব। দ্বীপটি গ্রিসের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা দক্ষিণে। এযুগের 'সিধু জ্যাঠা'র (গুগল) থেকে জেনেছি, গ্রিসের এই অতি সুন্দর ও মনোরম দ্বীপটি পর্যটকের কাছে পৃথিবীর সর্বাধিক আকর্ষণীয় স্থানগুলোর সামনের সারিতে। শান্ত ইজিয়ান সাগরের অন্তহীন রূপরাশি দেখতে দেখতে দুপুরের আগেই নানান দ্বীপ পেরিয়ে পৌঁছলাম সেখানে।

স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

সান্তোরিনির জাহাজঘাটা থেকে সমুদ্রের কিনারা ধরে ছোট এবং আরামপ্রদ আট সিটের গাড়িটি পাকদন্ডি বেয়ে হোটেলে পৌঁছনোর পথে চোখে পড়ল কী সুন্দর সর্পিল এই পাকদন্ডির সন্নিবেশ – বিশাল পারাবারের জলস্তর থেকে ক্রমশ ওপরে, আরও ওপরে – বিভিন্ন থাকের বসতির দিকে উঠে গেছে। এক অপূর্ব দৃশ্য!

৩৬০০ বছর আগে আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড বিস্ফোরণে আর লাভা উদগীরণের ফলে ইজিয়ান সাগরের এই দ্বীপটি কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত হয় এবং এখানে ব্রোঞ্জ যুগের মিনোয়ান সভ্যতার বিনাশ হয়। দ্বীপটির চেহারাটি এখন জলরাশির চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা অতি সুবৃহৎ আয়তকার দ্বীপপুঞ্জে পরিণত। পর্যটকদের মূল আকর্ষণ সান্তোরিনি বা 'থিরা' এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ। জলস্তর থেকে দ্বীপটির বসতি অনেকটা উঁচুতে – যেন অতিকায় এক কড়াই এর কানা ধরে সেগুলির অবস্থান।

আমাদের হোটেলটি সান্তোরিনির প্রধান শহর 'ফিরা'তে। এর খুব কাছেই হাঁটাপথে সাত-আট মিনিট দূরে ক্যালডেরা নামে স্থানটি সমুদ্রের পার ধরে টানা অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়ানো। এক একটা দিক সুন্দর ঝকঝকে ছবির মতো। অর্থোডক্স চার্চ নামে উজ্জ্বল সাদা রঙের একটি আকর্ষণীয় চার্চ রয়েছে এখানে।

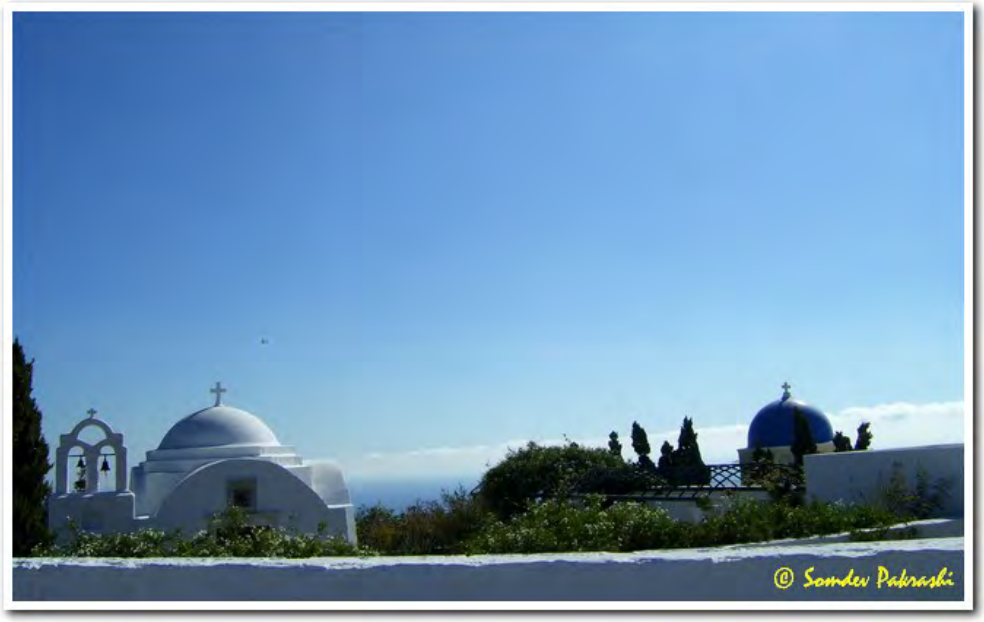

সেখানে ছড়িয়ে। সান্তোরিনির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তার সমুদ্রবক্ষে সূর্যাস্ত। হোটেলে লাঞ্চ সেরেই তা দেখার জন্য রওনা হলাম সমুদ্রপাড়ে 'ক্যালডেরা'র পথে। 'ক্যালডেরা' শব্দটি স্পেনীয়। ইংরাজীতে তর্জমায় হবে 'কলডর্ন্' – আমাদের ভাষায় 'কড়াই'।

সমুদ্রতল থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচু ক্যালডেরার পাড় থেকে সমুদ্র এবং সান্তোরিনির বসতির মিলিত দৃশ্য অনুপম। ভাষায় প্রকাশ করার থেকে সে সৌন্দর্যে নীরবে অবগাহন করা অনেক সহজ এবং শ্রেয়।

প্রতিটি বাড়ির দেওয়াল থেকে ছাদের উপরিভাগ পর্যন্ত ধবধবে সাদা। চোখধাঁধানো উজ্জ্বল, ঝকঝকে। মাঝে দু-একটি হালকা কমলা রঙের বাড়ি। এখানে সেখানে উজ্জ্বল নীল রঙের গম্বুজ। বসতিগুলির মাঝে বিভিন্ন উচ্চতায় থাকে থাকে ছিমছাম পায়ে চলার পথ যেন ছন্দোবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত। সমস্তটা মিলে এক একটি দিক যেন ফ্রেমে-বাঁধাই এক একটি অপূর্ব ছবি। আমরা বিমোহিত।

ভ্রূভঙ্গী করছে। এদিক সেদিকে কিছু ছোটবড় ফেরি চলমান। ডোবার অব্যবহিত আগে সূর্য একটি ছোট্ট পাহাড়গাত্র স্পর্শ করল। মুহূর্তে চারিধার সামান্য আঁধার। সেই মুহূর্ত হতে প্রতিক্ষণে অতিদ্রুত নিম্নগামী দিনকরের নিচে নামা, জলরাশি চুম্বন এবং ডুবে যাওয়ার চিরাচরিত অথচ চিরনূতন সেই প্রতিটি লহমা অনন্য হয়ে প্রকৃতির রঙের খেলার মধ্যে আমাদের অনুভূতিকে এক অন্য মাত্রায় বেঁধে দিল। সূর্যডোবার পালা শেষ। সর্বত্র যেন ছেয়ে আছে মায়াবী এক আলো – এক মনলোভা নতুন আবেশের রঙ চারিদিকে।

ক্যালডেরার পাকদন্ডীর পথে একটি চত্বরের রেস্তোঁরায় নানা মনকাড়া খাদ্যখানা ও সঙ্গে এখানকার আঙুর থেকে তৈরি পৃথিবীবিখ্যাত ওয়াইন ভিনসাঁটো আস্বাদন করা গেল। এক কথায় অনবদ্য। দোকানি জানাল ভিনসাঁটোর চুমুকের সঙ্গে ক্যালডেরাতে সূর্যাস্ত দেখার মজাই নাকি আলাদা।
পরের দিন সকালের দিকে দুটি ওয়াইনারিতে আঙুর থেকে কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়াইন তৈরি করার ব্যাপারটি সবিস্তারে দেখলাম। সেখানে আবার এর অনেকটা সময় নানা ওয়াইনের স্বাদ নিতে চমৎকার ভাবে কাটল।

সমস্ত জায়গাটি সংরক্ষণমূলক কাজের জন্য ঘেরা। ফলে আজ বিশদভাবে সেসব দেখা সম্ভব হলনা।। উঁকিঝুঁকি দেখা আর প্রদর্শকের বিবরণে কিছুটা আভাস পেলেও তা এই দ্বীপটির প্রত্নতাত্ত্বিক সুপ্রাচীনতাকে ভাল করে জানার ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দিল কেবলমাত্র। কী আর করা। সামান্য ক্ষুণ্নমনেই আজ হোটেলে ফিরতে হল।

পরদিন সকালে সামান্য তাড়াহুড়ো করে ব্রেকফাস্ট সারলাম হোটেলে – সান্তোরিনি থেকে জলপথে নিও কামেনি দ্বীপে যাব জীবন্ত আগ্নেয়গিরি দেখতে। মিঞা-বিবি দুজনেরই চাপা উত্তেজনা রয়েছে সেকারণে। সকাল নটায় ট্রাভেল এজেন্সির গাড়ি আমাদের নিয়ে যাবে ফেরি ঘাটে। কিছুক্ষণ আগে থেকেই হোটেলের সামনের মোড়ে এসে গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে। গাড়ি এল সোয়া নটার পর। যাহোক, আশ্বাস পাওয়া গেল যে সময়মতোই যথাস্থানে পৌঁছব। পরিষেবার এই সামান্য বিচ্যুতি নিজগুণে মাফ করা ভাল। কিন্তু ফেরিঘাটের কাছে এসে কোনটা আমাদের ফেরি, কোথায়বা তার সঠিক অবস্থান কিছুই বোঝা গেলনা। কিছুপরে গাড়ির চালক আর তার সহকর্মীটি একটি যাত্রীপূর্ণ সাধারণ ফেরি অল্প দূর থেকে আমাদের জন্য নির্ধারিত জলবাহন বলে দেখিয়ে দ্রুত বিদায় নিল। বিচলিত হয়ে ফেরিটির কাছে যেতে না যেতে দেখা গেল সেটি ঘাট ছেড়ে জলপথে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী জোরালো হাঁকডাক বা অনুরোধ, উপরোধ আদৌ তাদের কর্ণগোচর হয়েছে বলে মনে হলনা। আমাদের নিয়ে আসা গাড়িটিও ইতিমধ্যে অদৃশ্য। পার্কিংলটেও সেটি দেখা গেল না। ট্রাভেল এজেন্সির এধরণের বালখিল্য ব্যবহারে নিতান্তই নিরাশ আমরা কিছুটা দূরে অভিযোগ ও প্রতিকার সম্পর্কিত অফিসে ঘটনাটি জানালেও কোনো সুরাহা হলনা। সনির্বন্ধ অনুরোধে হোটেলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাটি কেবল করানো গেল। দিনটা আজ পুরোই নষ্ট হবে ধরে নিয়ে বারোটা নাগাদ ফিরে হোটেল লাউঞ্জে চুপচাপ বসে কী করা যায় ভাবছি – দেখি ফ্রন্টডেস্কের মেয়েটি নিজেই দুকাপ গরম কফি ও অল্প স্ন্যাক্স নিয়ে হাজির। আমাদের যাত্রাভঙ্গের পুরো বিবরণ শুনে সে মর্মাহত। অবাক হলাম যখন সে ডেস্কে ফিরে দু-একটা ফোনবার্তার পর ট্রাভেল এজেন্সিটির এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমাকে বিশদে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিল এবং আশ্বাস দিল যে আজই দ্বিতীয় ব্যাচের ফেরিতে গন্তব্য দ্বীপটিতে যাবার ব্যবস্থা অবশ্যই হয়ে যাবে। নিট ফল – ট্রাভেল এজেন্সির হয়ে কর্তাব্যক্তিটির ক্ষমা প্রার্থনা এবং আগের দেওয়া খরচেই সেদিন আরও ভালো প্যাকেজে আরামপ্রদ ফেরিতে ফ্রি লাঞ্চ এবং যাত্রাপথে সূর্যাস্তদর্শন ইত্যাদি। সঙ্গে সজীব আগ্নেয়গিরির দ্বীপে প্রতীক্ষিত ভ্রমণ। এহেন অভিজ্ঞতা গ্রিকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। এ আতিথেয়তা ভোলার নয়।

যাহোক, সেদিন আফ্রোদিতি নামের ভারী সুন্দর একটি ফেরি ভরদুপুরে নিও কামেনি দ্বীপে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুটা চড়াই পেরিয়ে পথে দুধারে চোখে পড়ল ছোট বড় কালো আর ঘন খয়েরি রঙের লাভার পাহাড় – শুকিয়ে এখন পাথর। এর খানিক পরেই পৌঁছে গেলাম সজীব আগ্নেয়গিরির এক ক্রেটারের কাছাকাছি। সমস্ত এলাকাটা কিছুটা গরম। এই ক্রেটারটি সামান্য গভীর, বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে এর অবস্থান। ধূসর কালো নানান সাইজের ছোটবড় দানা আর মাটির আলগা মিশ্রণ রয়েছে অনেকটা জায়গা ধরে।

সঞ্চালক ভদ্রলোক এসে ইংরেজি, ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মান এবং অবশ্যই গ্রিক ভাষায় এই সজীব আগ্নেয়গিরির ইতিবৃত্তান্ত ব্যক্ত করার সুযোগে আমরা এবং আরো দু-পাঁচজন সেখান থেকে আরও কিছু ওপরের পথে গিয়ে দূরে ওই নিচে জাহাজ ভাসা বিশাল জলরাশির ওপারে সান্তোরিনির ঝকমকে সুন্দর সাদা বসতওলা দৃশ্যপটের বেশ কয়েকটা বিভিন্ন কোণ থেকে ক্যামেরাবন্দী করে ফেললাম।

আগ্নেয়গিরি দেখে ফেরার পথে ফেরিতে সুস্বাদু আমিষভোজের সঙ্গে লাল ওয়াইন, শেষপাতে মিষ্টি এবং এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি তরমুজে আমরা একেবারে তরতাজা। নতুন উদ্যমে ডেকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে কখনও নিবিষ্ট মনে দেখছি সাগরের প্রায় নিস্তরঙ্গ জলরাশির মধ্য দিয়ে আমাদের সুন্দর ফেরিটি কেমন তরতর করে এগিয়ে চলেছে। পথে রূপ আর বর্ণের বাহার নিয়ে অল্প বিস্তর ছোট বড়ো ফেরি বা দু-একটা বিশাল সাদা রঙের জাহাজ আমাদের মুগ্ধ করে এখানে সেখানে ভাসমান। কখনও দেখা যায় সুন্দর সাদা, খয়েরি, ঘন কালো বা সবুজাভ হলদেটে রঙে রঙিন সৈকতভূমি –যেখানে কিছুটা দূর যেতেই চওড়া পথরেখা এঁকেবেঁকে ক্রমশ ওপরে, আরও ওপরে উঠে ছোট ছোট বসতির দিকে মিলিয়ে গেছে। তৈরি করছে এক একটি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যান্তর। সব মিলিয়ে ভারী মনকাড়া এই সমুদ্র ভ্রমণ।

সঞ্চালকের বার্তায় জানা গেল ফেরিপথে সামান্য দূরে প্যালিও কামেনি নামে একটি ছোট্ট দ্বীপের কাছে এক প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণ আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল। সাগরের এই অংশের নিচে বহুযুগ আগে আগ্নেয়গিরির সক্রিয় কার্যকলাপের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এই উষ্ণ প্রস্রবণ। সেজন্য এখানে জল সর্বদাই কুসুমকুসুম গরম আর শরীর ভাল করার নানা খনিজ মেশানো। জলের রঙেও দেখলাম হলদেটে ভাব। বিশেষ করে পাড়ের দিকে। পর্যটকদের অবগাহনের অনুমতি রয়েছে এই অংশে। সেজন্য 'আফ্রোদিতি' কিছু সময় দাঁড়িয়ে গেল এখানে। সুদূর গ্রিসে সমুদ্র সাঁতারের এই অভাবিত সুযোগ হাতছাড়া করিনি।

এবার সান্তোরিনিতে ফেরার পালা। ফিরতি পথে ফেরি থেকে অপার সাগরবক্ষে সূর্যাস্ত দেখা আরও একটি অসামান্য অনুভূতি।

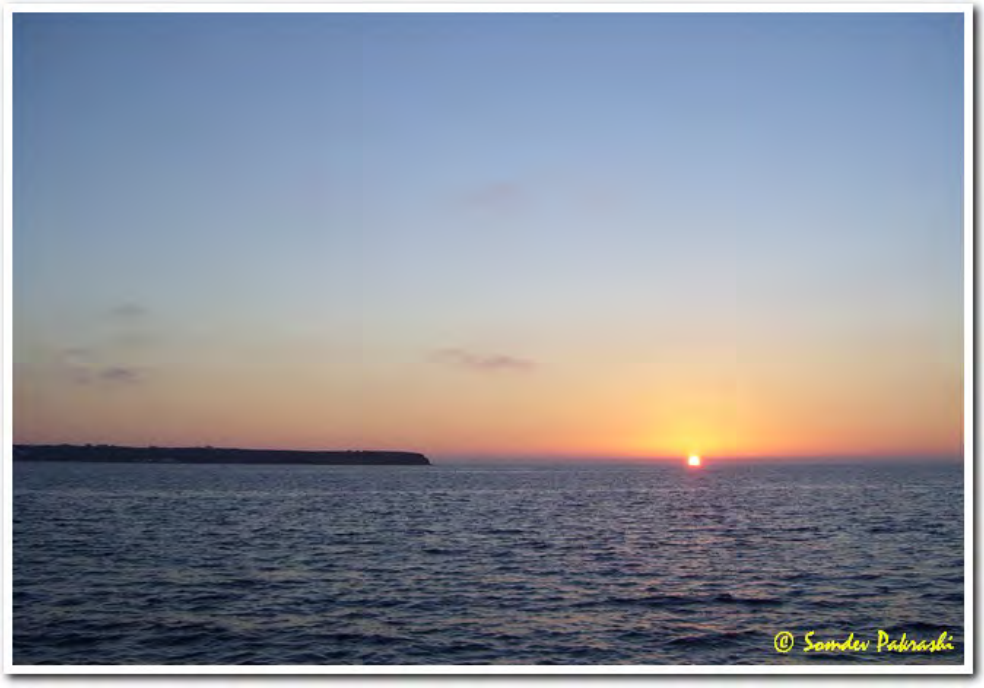

ফেরার পথে সন্ধ্যার আধো আঁধারে নজর পড়তেই দেখা গেল ফেরি থেকে সামান্য দূরে ঝকমকে আলোকোজ্জ্বল আমাদের সান্তোরিনি যেন নতুন সাজে সেজেছে। যেন দ্যুতিময় হীরের মুকুটে সজ্জিতা অপরূপা!

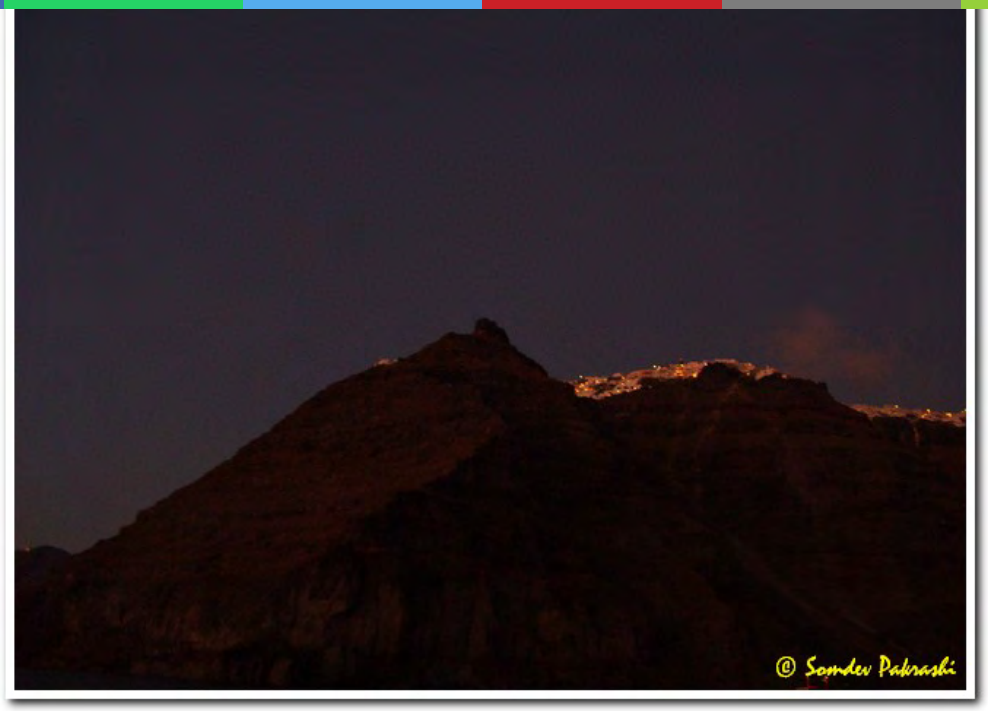

পরেরদিনটি ছিল নির্ঝঞ্ঝাট উপভোগের। গোটাদিন নানারঙের সৈকতভূমিতে অনেকটা সূর্যস্নাত সময় কাটালাম চমৎকারভাবে।
কেমন যেন চট করে ফুরিয়ে গেল প্রাণোচ্ছল দিনগুলো। ভ্রমণজাত সম্পদগুলি ক্যামেরা এবং মনের মণিকোঠায় এবার বন্দী করে ফিরতে হবে।

বর্ষীয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সোমদেব পাকড়াশী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। বহু বছর দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকুরির পর বর্তমানে কলকাতাতে একটি জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সালটেন্সি সংস্থার অধিকারী।

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

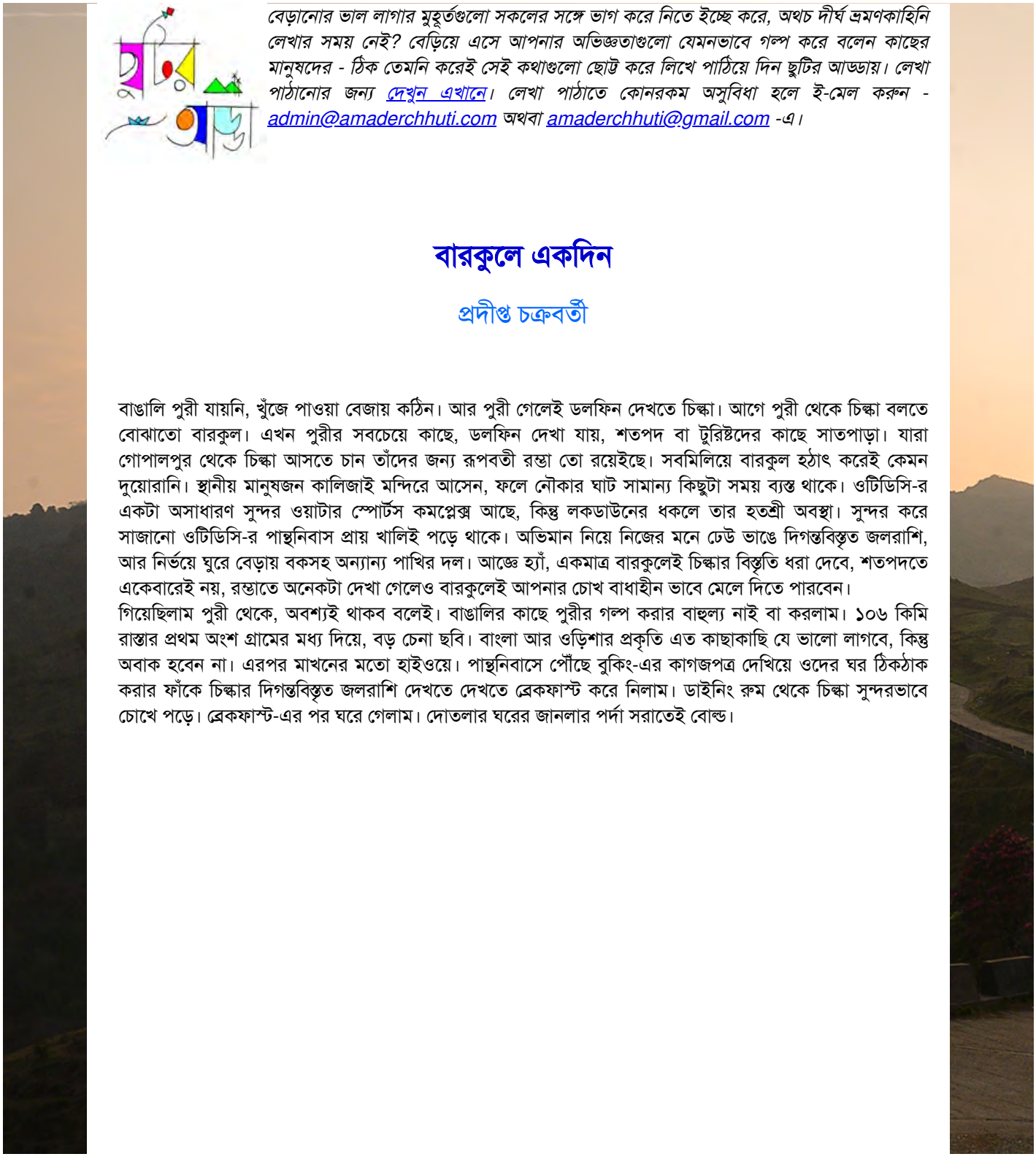

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

বারকুলে একদিন

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

বাঙালি পুরী যায়নি, খুঁজে পাওয়া বেজায় কঠিন। আর পুরী গেলেই ডলফিন দেখতে চিল্কা। আগে পুরী থেকে চিল্কা বলতে বোঝাতো বারকুল। এখন পুরীর সবচেয়ে কাছে, ডলফিন দেখা যায়, শতপদ বা টুরিষ্টদের কাছে সাতপাড়া। যারা গোপালপুর থেকে চিল্কা আসতে চান তাঁদের জন্য রূপবতী রম্ভা তো রয়েইছে। সবমিলিয়ে বারকুল হঠাৎ করেই কেমন দুয়োরানি। স্থানীয় মানুষজন কালিজাই মন্দিরে আসেন, ফলে নৌকার ঘাট সামান্য কিছুটা সময় ব্যস্ত থাকে। ওটিডিসি-র একটা অসাধারণ সুন্দর ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স আছে, কিন্তু লকডাউনের ধকলে তার হতশ্রী অবস্থা। সুন্দর করে সাজানো ওটিডিসি-র পান্থনিবাস প্রায় খালিই পড়ে থাকে। অভিমান নিয়ে নিজের মনে ঢেউ ভাঙে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি, আর নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় বকসহ অন্যান্য পাখির দল। আজ্ঞে হ্যাঁ, একমাত্র বারকুলেই চিল্কার বিস্তৃতি ধরা দেবে, শতপদতে একেবারেই নয়, রম্ভাতে অনেকটা দেখা গেলেও বারকুলেই আপনার চোখ বাধাহীন ভাবে মেলে দিতে পারবেন।

গিয়েছিলাম পুরী থেকে, অবশ্যই থাকব বলেই। বাঙালির কাছে পুরীর গল্প করার বাহুল্য নাই বা করলাম। ১০৬ কিমি রাস্তার প্রথম অংশ গ্রামের মধ্য দিয়ে, বড় চেনা ছবি। বাংলা আর ওড়িশার প্রকৃতি এত কাছাকাছি যে ভালো লাগবে, কিন্তু অবাক হবেন না। এরপর মাখনের মতো হাইওয়ে। পান্থনিবাসে পৌঁছে বুকিং-এর কাগজপত্র দেখিয়ে ওদের ঘর ঠিকঠাক করার ফাঁকে চিল্কার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। ডাইনিং রুম থেকে চিল্কা সুন্দরভাবে চোখে পড়ে। ব্রেকফাস্ট-এর পর ঘরে গেলাম। দোতলার ঘরের জানলার পর্দা সরাতেই বোল্ড।

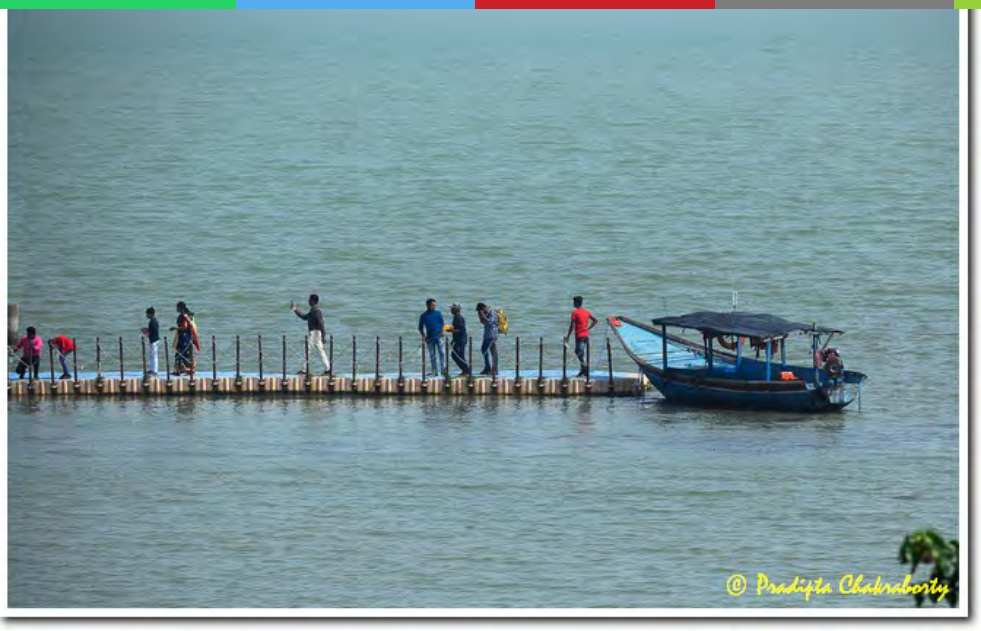

চোখ মেলে দিলাম, সামনে চিল্কার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি, সামনে ছোট ছোট নৌকা, অনেকটা ভিতরে ঢুকে আসা জেটি। মাঝে মাঝে কালিজাই মন্দিরে যাওয়া আসা করা নৌকা, তাদের আরোহীদের যাতায়াত, নিটোল একটা ছবি। এক চক্কর দিতে বেরোলাম বাইরেটাতে। নভেম্বরের ১ তারিখ হলেও বেশ ভালো গরম। কিছুক্ষণ পাখির পিছনে সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরলাম। কোভিডের সময়, তাই যথাসাধ্য পরিষ্কার করে, স্নান করে জানলার ধারেই বসে রইলাম। এই জানলার ধারে বসেই একটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় বারকুলে। অলস চালে সময় কেটে গেল অনেকটা সেটা টের পেলাম লাঞ্চের ডাক পড়তে। কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে ভাত অমৃত মনে হলো। দুপুরের ভাতঘুম বিছানায় টানছিল, কিন্তু আরো বড় টান ওই জানলাটার, ফলে হাতপা ছড়িয়ে বসে গেলাম। জলের দুলুনিতে নৌকাগুলো দুলছে, নৌকার মানুষগুলোর মধ্যেও কেমন একটা আলস্যজড়ানো চলন। গরম একটু কমতেই ক্যামেরা বাগিয়ে বাইরে। খেয়াল করলাম আকাশ ভালোই মেঘলা, আলো যথেষ্ট, কিন্তু সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো, বন্ধ ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এর ভিতরে খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম, চিল্কার ভিতর ঘিরে রাখা অংশ, একটুখানি জায়গা দিয়ে জল ঢোকে, শান্ত, কয়েকটা ভাসমান জেটি, তবে অযত্নের ছাপ সর্বত্র, ভাঙা রেলিং, ময়লা। বুঝলাম লকডাউনের প্রভাব। এলাম নৌকা ছাড়ার জেটিতে, এইবার টের পেলাম দুলুনি। এই অংশ বাধাহীন, হাওয়ায় চিল্কার জলে ঢেউ উঠছে, তালে তালে দুলছে ভাসমান জেটি, বেশ মজা লাগছিল। আলো কমতে ঘরে ফিরলাম। আবার সেই জানলার ধার।

সন্ধ্যেবেলা পাখির দল ঘরে ফিরছে। ওটিডিসি-র পাশেই একটা অংশে বড় বড় গাছ, সেখানে এদের আস্তানা, ফলে এদের চলাফেরা লক্ষ্য করার পক্ষে আদর্শ জায়গা। সন্ধ্যে নামছে, শেষ বোট কালিজাই থেকে ফিরে আসছে, লগি ঠেলে মাঝিরা ফিরছে। আকাশে নীল রঙের ছোঁয়া, সূর্যদেব মুখ দেখালেন না যে। রাতের খাবার ঘরে এনে খেয়ে ঘুম।

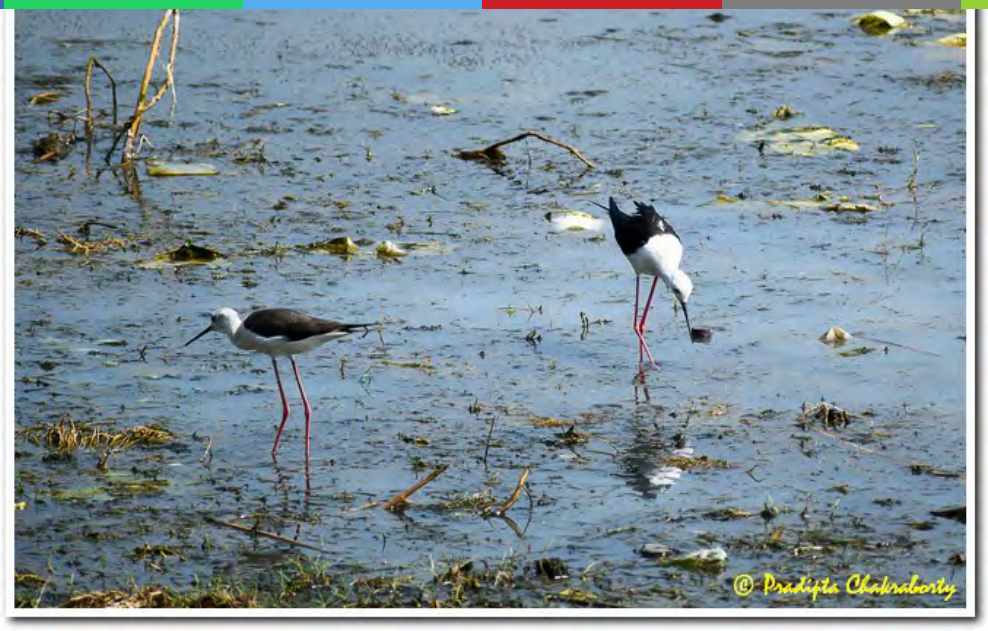

সকালের চেনা লালচে নরম আলো নয়, ঘুম ভাঙল কেমন একটা ধূসর আলো নিয়ে। দেখলাম রাতে বৃষ্টি হয়েছে, তখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে, তবে খুব সামান্য। ধূসর মেশানো নীল আলো মেখে চিল্কার ঘুম ভাঙছে।

মাছধরা নৌকাগুলো ইতিউতি ঘুরছে, কেমন একটা মনখারাপ করা সকাল। চা হাতে নিয়ে এই ছবির সামনে বসে থাকা, কোনও কথা নয়, নীরবতাই এখানে শ্রেয়। বৃষ্টি থামল, আবার বেরোলাম, এখানে থাকার আয়ু তো আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। পান্থনিবাসের ভিতরটাও খুব সুন্দর, ফুল, বড় বড় গাছ, সেখানে প্রচুর প্রজাপতিও আসে।

বাইরে এলাম, পাখির দল তখন রীতিমতো শোরগোল তুলে দিয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দুদল পাখি সামান্য ঝগড়ার পরেই 'হাত থাকতে মুখে কেন' নীতি মেনে মারামারিতে লেগে গেল। বেশ কেটে গেল সময়টা।

ব্রেকফাস্ট করে স্নান সেরে মালপত্র রিসেপশনে জমা দিয়ে (ঘর ছেড়ে দিয়েছিলাম) চললাম বোট নিয়ে কালিজাই মন্দিরের পথে। সঙ্গিসাথী না পাওয়ায় আমরা কত্তাগিন্নি দুজনে মিলেই পুরো বোট নিয়ে চললাম। বারকুল গেলে এই বোট অবশ্যই চড়বেন, নইলে মজা অনেকটাই অধরা থেকে যাবে। শুরুতে শান্ত জলে চলা শুরু, একটু পরেই হাওয়ার দাপটে জলে ঢেউ আর পাল্লা দিয়ে নৌকার দুলুনি। ছবি তোলা মাথায় উঠে গেছে, ক্যামেরা ব্যাগ থেকে বের করতেই পারছি না, মাঝি অভয় দিচ্ছে কিছু হবে না। আর অভয়, নৌকা মাঝে মাঝে কাত হয়ে জল ঢুকে যায়-যায় অবস্থা! ঢেউ নৌকার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে কালিজাই মন্দির পৌঁছে গেলাম। ওড়িশার আর পাঁচটা সাধারণ মন্দিরের মতই। ফেরার পথে মাঝি লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে দিল। স্ত্রী বললেন, এটা ভ্যাকসিনের মত, কাজ হবে কিনা জানি না, কিন্তু আত্মবিশ্বাস দেবে। সত্যিই ফেরার সময় একই দুলুনিতে অত ভয় করেনি। ঘন্টা দুয়েক লাগবে পুরো বোট রাইডে। ফিরে এসে পান্থনিবাসে লাঞ্চ করে একটা অটো নিয়ে বালুগাঁও-এর পথে, সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া।

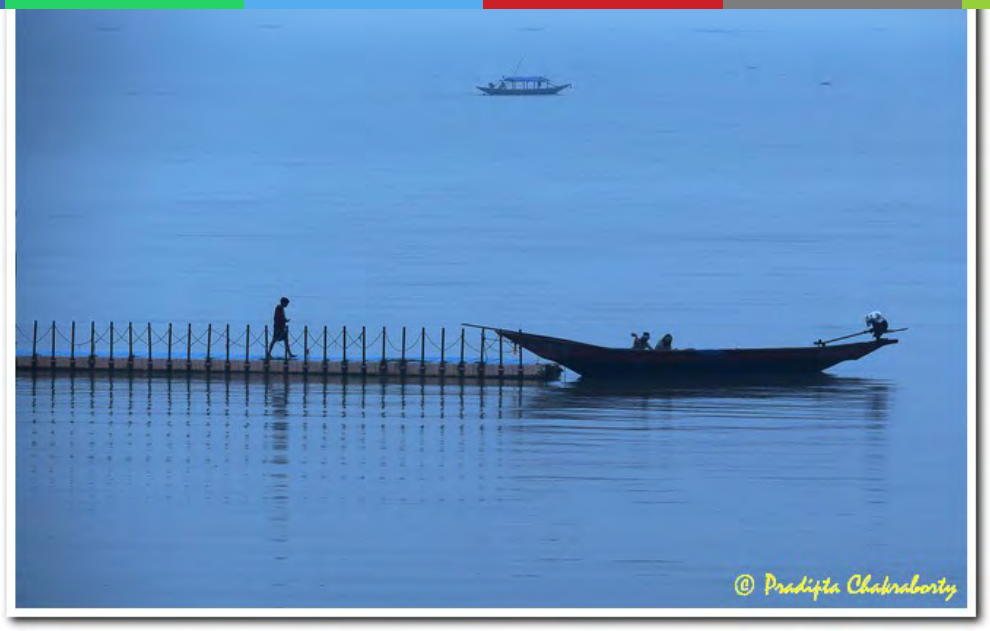

পেশায় শিক্ষক প্রদীপ্ত চক্রবর্তী নেশায় আলোকচিত্রী ও ভ্রামণিক।

টেমি চা-বাগিচায়

বাপ্পাদিত্য বর্মন

বেড়ানোর নতুন জায়গার সন্ধান করতে করতে জানতে পারলাম সিকিমের একমাত্র চা বাগান টেমি-র কথা। আর আমার পছন্দের ভ্রমণতালিকায় সিকিমের নাম বরাবর ওপরের দিকেই থাকে।

দক্ষিণ সিকিমের টেনডং পাহাড়ের টেমি চা বাগানের উচ্চতা ৫০০০ ফুট। ৪৫৩ একর পরিধি জুড়ে বিস্তৃত এই চা বাগানের অপূর্ব শ্যামলিমা দেখে জুড়িয়ে যায় চোখ। শুধু সেটুকুই নয় কাবরু, কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ অন্যান্য শৃঙ্গরা দৃশ্যপট আরও অতুলনীয় করে তুলেছে।

নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি গাড়িতে টেমি টি গার্ডেনে পৌঁছানো যায়। তবে আমরা গ্যাংটকে কিছুদিন কাটিয়ে রাবাংলা, নামচি ঘুরে টেমি টি গার্ডেনে পৌঁছালাম।

নামচি থেকে মাখনের মত মসৃণ আর চকচকে রাস্তা বরাবর টেমির দূরত্ব মাত্র ২৫ কিলোমিটার। আমাদের থাকার জায়গা ছিল একদম চা বাগানের মধ্যে সিকিম সরকার দ্বারা পরিচালিত 'চেরি রিসর্ট'। আবাসস্থলটির স্থান মাহাত্ম্যে অতুলনীয়। চেরির হাসিতে মুখরিত হয়ে আছে। ১৮০ ডিগ্রি ব্যাপী এক অসাধারণ প্যানোরমা দৃশ্যমান এখান থেকে। এক লহমায় ভালোবেসে ফেললাম শান্ত সুন্দর জায়গাটিকে। চা বাগানের মধ্যে নীল আকাশের নিচে চেরি রিসর্টকে দূর থেকে দেখে মনে হবে, জল রঙ দিয়ে কেউ যেন একটা অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপ এঁকে রেখে দিয়েছে।

দুপাশে ঢালু বাগানের মধ্য দিয়ে পিচের রাস্তা চলে গেছে রিসর্টের সামনে। গাড়ি থেকে নামতেই প্রথম অনুভব করলাম বাতাসে কাঁচা চা পাতার গন্ধ। চোখ বুজে সেই গন্ধ বুক ভরে নিলাম। অপরিচিত এই গন্ধের এক অদ্ভুত মাদকতা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে নির্ধারিত ঘরে পৌঁছালাম। কাচের জানালার ভারী পর্দা সরিয়ে যেদিকেই তাকাই চায়ের বাগান। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে পাহাড়ের পিছনে অস্ত যেতে ব্যস্ত। আকাশে রঙের খেলা শুরু হয়েছে। হু হু করে ফুরিয়ে যাছে দিনের আলো। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই জমাট অন্ধকারে ঢেকে যাবে সব কিছু। আলো জ্বলে উঠল অনেক দূরে পাহাড়ের ছোট ছোট গ্রামগুলোতে। এক ঝাঁক জোনাকির মতো জ্বলে নেভে নিঃশব্দে। তখনই মহার্ঘ্য চায়ের পাতা হাত, পা ছড়ায় উষ্ণতায়। রাত বাড়ে, দামি ক্রকারিজ-এ সার্ভড হয় ডিনার।

মোটা লেপের অলস আরাম ছেড়ে খুব ভোরে চেরি রিসর্টের বিশাল ছাদে এসে দাঁড়িয়েছি। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গগুলো ফুটে উঠছে। এক অচেনা অদ্ভুত সুন্দর পৃথিবী আমার সামনে। নিস্পলক দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই সদ্য ঘুমভাঙা রূপ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি।

হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে চললাম চা বাগানের মধ্যে হাঁটাহাটি করতে। অসীম নির্জনতা চারদিক ঘিরে আছে। বাগানের মধ্যে আছে টেমি চা ফ্যাক্টরি। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম সেখানেই। কারখানার গেট থেকে টিকিট কেটে ভিতরে ঢোকা যায়। আর আছে টি-স্টল। বিভিন্ন প্রকার চা খাওয়া যায়, আবার প্যাকেট চা কেনা যায়। কারখানা থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাগানে বেড়াতে চললাম। নিচ থেকে চা বাগানের দৃশ্য অনবদ্য।

এরপর ব্রেকফাস্টের জন্য রিসর্টে ফেরার পালা। নামার থেকে ওঠার সময় লাগল তিনগুণ। তবে অপূর্ব সুন্দর চা বাগানের দৃশ্য কখনও ক্লান্ত হতে দেবে না। কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। চলছে চা পাতা তোলার কাজ। এক ঝাঁক মেঘ এসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অদৃশ্য করে দিল। মাঝে মাঝে কুয়াশা ঘিরে ধরছে। মেঘ-কুয়াশার মধ্যে চা বাগান যেন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

অ্যাডভেঞ্চারের সব ব্যবস্থা আছে এখানে। আছে জিপ লাইন, প্যারাগ্লাইডিং-এর ব্যবস্থা। রিসর্ট থেকে একটা গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলাম জিপলাইন আর প্যারাগ্লাইডিং করতে। আকাশে উড়তে উড়তে পাখির চোখে গোটা চা বাগানের দৃশ্য সারা জীবন মনে রেখে দিতে হবে। সারাদিন যে কী ভাবে কেটে গেল বোঝা গেল না। আগামীকাল যাবো পেলিং, কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে এখানে যদি আরও কটা দিনের বুকিং থাকত!

স্কুল শিক্ষক বাপ্পাদিত্য বর্মন-এর শখ বেড়ানো আর বই পড়া।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher